সুর ও সঙ্গতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সুর ও সঙ্গতি

সুর ও সঙ্গতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বালিগঞ্জ, ৯ কস্তুমণ্ডী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ভারতী ভবন
২৪।৫ এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য— ১৲ টাকা

মডার্ণ আর্ট প্রেস, কলিকাতা, ১।২ দুর্গা পিতুড়ী লেন হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদিত

অতুলপ্রসাদের
স্মরণে

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার অধ্যাপকীয় চিত্তবৃত্তি আমার কাছে ক্রমশই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কুঁড়েমি জিনিষটার উপর তোমার কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাবেই এই তোমার কঠিন পণ। কিন্তু সম্প্রতি এমন মানুষের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া চলবে, যে চিরকাল ইস্কুল-পালানে, কুঁড়েমি যার সহজধর্ম্ম। বাল্যকাল থেকে কত কর্ত্তব্যের দাবী আমাকেই আক্রমণ করেছে, প্রতিহত হয়েছে বারবার। নইলে আজ তোমাদের মতো এম, এ পাস ক'রে নাম করতে পারতুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়ো উপাধি নিয়ে লজ্জা রক্ষা করতে হোত না। তুমি বলছ সঙ্গীত সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে আড়াইশো পাতাব্যাপী আনাড়ী-তত্ত্ব প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য। সেটা যে ঘটবে না তার প্রথম ও প্রধান কারণ আমার সমুদ্ধত কুঁড়েমি। যারা কর্ত্তব্যের তাড়া খেয়ে খেটে মরে তারা তো মজুর শ্রেণীর। তাদের কেউবা বৈশ্যজাতীয়, কর্ত্তব্যসাধনে যাদের মুনফা আছে, কেউবা পরের ফরমাসে কর্ত্তব্য করে—তারা শূদ্র, কেউবা

কর্ত্তব্যটাকে গদাস্বরূপ ক'রে হন্যে হয়ে বেড়ায়, তারা ক্ষত্রিয়। আবার কেউবা কর্ত্তব্য করে না, কাজ করে, যে কাজে লোভ নেই লাভ নেই, যে কাজে গুরুমশায়ের শাসন বা গুরুর অনুশাসন নেই—তাদের জাতই স্বতন্ত্র। যখন তুমি বৌদ্ধিক অর্থনীতিসম্বন্ধে বই লিখবে তখন আমার এই তত্ত্বকথাটা চুরি ক'রে চালিয়ো, নালিশ করব না। যে সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখিনি, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মাষ্টারপীস্‌টা সেই অলিখিত রচনা-রত্ন-ভাণ্ডাগারে রয়ে গেল। আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট ক'রে লিখে দিয়ে যাব তবে যারা থীসিস্‌ লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করবে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে। সেই সব অনাগতকালের থীসিস্‌-রচয়িতার কল্পচ্ছবি আমার মনের সামনে ভাসছে, তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জ্জনাকুণ্ড থেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের ক'রে তাব ঘণ্ট তৈরি করছে—যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না সেইটেতেই তাদের মহোল্লাস। আমি তাদের আশীর্ব্বাদভাজন হোতে চাই। ইতি

তোমাদের

মাঘ, ১৩৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ধূর্জ্জটি, তোমাকে লেখা একটা পুরোনো চিঠির প্রতিলিপি আমি রেখে দিয়েছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল। দেখতে পাচ্চি তোমাকে নানাপত্রে গান সম্বন্ধে আমার মত জানিয়েছি। আবার নতুন ক'রে আমাকে তাগিদের দ্বারা চিঠিয়ে তুলচ কেন? এ সম্বন্ধে আমার মত সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি-সমুন্নতির সবিশেষ সহায়তা করবে বলে দুরাশা মনে রাখিনে। পত্রনিহিত মতগুলি সংগ্রহ ক'রে বা তদ্দ্বারা কীটপালনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে আমার অসম্মতি নেই। জীবনে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়েছে ততোধিক পরিমাণে, হয়তো বা ভাবীকাল তাদের জন্যেই বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

·········বাংলা দেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্চে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্দ্ধ-নারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্ব্বদা প্রাণবান করে রাখতে হোলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্ত্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে; প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। বর্ত্তমানে এর অনুরূপ আদর্শ দেখা যায় আমাদের বাংলা সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ বিচ্ছিন্ন হোলে এর স্রোত যাবে মরে, অথচ খাতটা এর নিজের, এর প্রধান কারবার নিজের দুই পারের ঘাটে ঘাটে। অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্ত্তি হয়েছে, যেমন হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি; নিজের টিকি পর্য্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা

করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘর-জামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না। তাই বলে স্ত্রীকে বজায় না রাখলে ঘর চলেনা। কিন্তু স্বভাবে ব্যবহারে সে স্ত্রীর ঝোঁক হওয়া চাই পৈতৃকের চেয়ে শ্বাশুরিকের দিকে, তবেই সংসার হয় সুখের। আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি--কিন্তু বাঙালীর ঘরে সে তো আতিথ্য দিতে আসবে না—সে নিজেকে দেবে, নইলে উভয়ের মিলন হবে না। যেখানে পাওয়াটা সম্পূর্ণ নয় সেখানে সে পাওয়াটা ঋণ। আসল পাওয়ায় ঋণের দায় ঘুচে যায়--যেমন স্ত্রী, তাকে নিয়ে দেনায় পাওনায় কাটাকাটি হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা ঐ। তাকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদী করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধ ভাবে মিল্‌চে না দেখে পণ্ডিতেরা যখন বলেন সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘট্‌চে তখন তাঁরা পণ্ডিতী

স্পর্দ্ধা করেন, সেই স্পর্দ্ধা সব চেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি সৌখীন বিলাসীর নয়—কলা-বিধাতার। বাংলায় সাহিত্যভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এক্ষেত্রে পণ্ডিতীর জয় হোলে বাংলা ভাষা আজ সীতার বনবাসের চিতায় সহমরণ লাভ করত। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে বলেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কার্য্য নব নব অধ্য-বসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাংলা গানেও কি তারই সূচনা হয়নি, এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না? ইতি

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই আগষ্ট, ১৯৩২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমি বারবার দেখেচি বর কানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্‌টর্‌ আনন্দ আছে। এবারে কিন্তু সময় খারাপ। ভিনগাঁয়ে যেতে হবে, লেকচার্‌ দেবার ডাক পড়েচে। মনের মধ্যে কথা বয়ন করবার যে তাঁতটা ছিল, এতকাল সে ফরমাস খেটেচে বিস্তর; এখন ঘনঘন টানা-পোড়েন আর সয় না, কথায় কথায় সূতো যায় ছিঁড়ে।

তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর সেদিনকার বকুনির * মধ্যে কোন একটা জায়গায় ছিল বলে মনে হচ্চে। বোধহয় যেন বলেছিলুম ঘরবাড়ি বালাখানা আপন খেয়ালমতো বানান চলে কিন্তু যে ভূতলের উপর তাকে খাড়া করতে হবে সেই চিরকেলে আধারের সঙ্গে তার রফা করাই চাই।

* First All Bengal Music Competition and Conference এর (Senate House, December 1934) উদ্বোধন।

তুমি জানো সঙ্গীতে আমি নির্ম্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি, তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকালে শিশুবোধে দেখেচি প্রেয়সীকে পত্র লেখবার বিশেষ পাঠ ও রীতি বেঁধে দেওয়া ছিল, সেটাতে তখনকার কালের প্রবীণদের সম্মতি ছিল সন্দেহ নেই। তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক্, প্রেমলিপি লেখবার সেই ছাঁদ যথার্থই অত্যন্ত মনোহর— কিন্তু কালান্তর ঘটতেই অর্থাৎ যৌবনকাল উপস্থিত হতেই দেখা যায় সে ভাষায় কোন পক্ষের মেজাজ সায় দেয়না। তখন স্বতই যে ভাষা দেখা দেয় তার মধ্যে পিতৃ-পিতামহদের অনুমোদিত ধ্রুব-নির্দ্দিষ্ট শব্দলালিত্য ও রচনানৈপুণ্য না থাক্‌তে পারে, ব্যাকরণের বিশেষত বানানের ভুলচুক থাকাও অসম্ভব নয়, দুটো একটা ইংরেজী শব্দও তার মধ্যে হয়তো অগত্যা ঢুকে পড়ে, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ত মুরুব্বিরা যাই বলুন না কেন তার মধ্যে যে সহজ রস সঞ্চার হয় তাকে অবজ্ঞা করা চল্‌বেনা। সেই মুরুব্বিরাই যদি ষোড়শী চতুর্থপক্ষীয়ার দিকে

দুর্নিবার ধাক্কায় ঝুঁকে পড়েন তবে হঠাৎ দেখা যাবে তাঁদের ভাষাও শিকল ছিঁড়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূল ভাষাটা বাংলা, সেখানে সেকাল একালের নাড়ীর যোগ। এই ভাষা বহুশতাব্দীর বহু নরনারীর বিচিত্র ভাবনা কামনা ও বেদনার নিরন্তর অভিঘাতে বিশেষ-ভাবে প্রাণময় চিন্ময় দীপ্তিময় হয়ে উঠেচে, বিশেষ-ভাবে বাঙালীর চিন্তা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যেই তার সৃষ্টি। এই জন্যে কোনো বাঙালীর যতই প্রতি-ভার জোর থাক বিদেশী ভাষার ভূমিতে সাহিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ সে স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারেনা। আমাদের বাংলা ভাষার রূপ বদল হচ্চে নিয়তই, বদল হতে যে পারে এই তার মহৎ গুণ—কিন্তু সমস্ত বদল হবে তার আদি প্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।

গান সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহুযুগের সৃষ্টি-করা যে সঙ্গীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া জোগাব কোথা থেকে? বাংলা দেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারি অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দুস্থানী গান

জানিনে বুঝিনে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে ; সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানেনা তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানেনা। হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেচেন সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানিনে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই ; ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্দ্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম—সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্ত্তনকাররাও করে গেছেন। ইতি

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৫

কল্যাণীয় ধূর্জ্জটি

কাল পর্য্যন্ত গেল বসন্ত উৎসবের আয়োজনে, আগামী কাল চলেচি কলকাতায়। এরই মাঝখানে এক-টুকরো অবকাশ—সংক্ষেপে সারতে হবে তোমার ফরমাস। —তোমাদের ওখানে গানের মজলিশে ছায়ানট গাওয়া হয়েছিল। ঘড়ি দেখিনি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হোলো একঘণ্টা পেরোলো বা। ছায়ানটের যত রূপরূপান্তর আছে, তান-কর্ত্তব সাবেগম, যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উলটোনো পালটানো যেতে পারে তার কিছুই বাদ পড়েনি। আমার অভিমত কী জানতে চাও, সময় খারাপ, বলতে সাহস করিনে। তোমাদের মেজাজ ভালো নয়; মত-বিরোধ নিয়ে তোমরা যাকে যুক্তি বলো আমরা তাকে বলি গাল, ঘাঁটাতে ভয় করি। তা হোক, গীত আলোচনায় যদি তোমার কানের সঙ্গে আমার কানের প্রভেদ দেখতে পাও তাহলে এই

বলে তার কারণ নির্ণয় কোরো যে তুমিই বিজ্ঞ আমি অনভিজ্ঞ, তারো ঊর্দ্ধে উঠে লোকবিশ্রুত উদার-কর্ণসম্পন্ন জীবের উপমা ব্যবহার কোরোনা—এ রকম সাহিত্যরীতিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

জানতে চেয়েছ ভালো লাগল কিনা। লেগেছে বই কি, কিন্তু ভালো লাগাই শেষ কথা নয়। বেঙ্গল ষ্টোর্সে গিয়ে যখন অসংখ্য রকম দামী কাপড় সারা প্রহর ধরে ঘেঁটে বেড়াই, ভালো লাগে, আরো ভালো লাগে, থেকে থেকে চমক লাগে, সংগ্রহের তারিফ করতে হয়। কিন্তু সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র সাড়ি দেখি, বলি বাস্ হয়েছে, বলিনে ক্রমাগত সব কটা সাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর মাত্রা বাড়তেই থাকবে—সব কাপড়গুলোই সমজদারের চোখে চমৎকার ঠেকতে পারে, যত সেগুলো উলটে পালটে নেড়ে চেড়ে দেখে ততই তারা বলে ওঠে ক্যা তারিফ্, সোভান আল্লা। ঠিক ঠাক্ বলতে পারে কোন্‌টাতে কত ভরি সোনার জরি, আঁচলার কাজ কাশ্মীরের না মাদুরার, মাঝের থেকে চাপা পড়ে যায় স্বয়ং সুন্দরী। ইংরেজী ভাষায় বলতে পারি, যদি ক্ষমা

করো, art is never an exhibition but a revelation। Exhibition-এর গর্ব্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা বলে একটা পদার্থ আছে চলার চেয়ে তা'র কম মূল্য নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরী। ওস্তাদী গানে সেই জরুরী নেই, সে কেন যে কখনোই থামে তার কোনো অনিবার্য্য কারণ দেখিনে। অথচ সকল আর্টেই সেই অনিবার্য্যতা আছে, এবং উপাদান প্রয়োগে তার সংযম ও বাছাই আছে। বস্তুত ছায়ানটের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট নয়—বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ রূপের সীমাতেই ছায়ানট আর্ট হতে পারে। সে রূপটাকে তানে-কর্ত্তবে তুলো ধুনে দিতে থাকলে বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের সেটা যতই ভালো লাগুকনা, আমি তাকে আর্টের শ্রেণীতে গণ্যই করব না। স্যাকরার দোকানে ঢুকলে চোখ ঝলমলিয়ে যাবে কিন্তু দোহাই তোমাদের, প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাকরার দোকানের সখ মিটিয়োনা। সেই প্রেয়সীই আর্ট, সেইই সম্পূর্ণ, সেইই আত্মসমাহিত। প্রোফেশনালের চক্ষে প্রেয়সীকে দেখোনা, দেখো

প্রেমিকের চক্ষে। প্রোফেশনাল বড়োবাজারে খুঁজলে মেলে, প্রেমিক বাজারের তালিকায় পাইনে, তিনি থাকেন বাজারের বাইরে—"ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" এইবার গাল সুরু করো; আমি চল্‌লুম। ইতি

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা পেয়েছ শুনে আরাম পেলুম। সামান্য কারণে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্য দূর হোলো।

কিন্তু তুমি আমাকে সঙ্গীতের তর্কে টেনে বিপদে ফেলতে চাও কেন? তোমার কী অনিষ্ট করেছি? এর পরেও যদি টিঁকে থাকি তাহলে হয়তো ছন্দের প্রশ্ন পাড়িবে।

আমার যা বলবার ছিল সংক্ষেপে বলেচি। বিস্তারিত বল্‌লে শরসন্ধানের লক্ষ্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া অত্যন্ত সহজ কথা কী করে বৃহদায়তন অত্যন্ত বাজে কথা করে তোলা যায় আমি জানিনে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের বক্তৃপদ ছেড়ে দিয়েছি, বাক্‌-বাহুল্যের অভ্যাস বেশিদিন টিঁকল না।

বিষয়টা truism অর্থাৎ নেহাৎ সত্যের অন্তর্গত। আমি তোমাকে আর্টের সর্ব্বজনবিদিত

লক্ষণের কথা বলেছি, বলেছি আকার নিয়ে কলেবর নিয়ে তার ব্যবহার। তোমরা যদি বলো হিন্দুস্থানী সঙ্গীত রাগরাগিণীর প্রটোপ্লাজম্, অর্থাৎ ওর আয়তন আছে, অসম্ভব রকমের স্থিতিস্থাপক প্রাণও আছে, সে প্রাণ পরিবর্ত্তনহীন আদিতম যুগেরও বটে, রস-রসায়নের বিশ্লেষণের দ্বারা ওর বিশেষ বিশেষ উপাদানেরও তালিকা বের করা যেতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো পরিমিত আকৃতির তত্ত্ব নেই, ও যথেচ্ছ ফুলে উঠতে পারে, লম্বা হতে পারে, চওড়া হতে পারে, চ্যাপ্টা হয়ে এগোতে এগোতে তিন চার পাঁচ ঘণ্টাকে আপনার তলায় সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে, তবে আমি তোমাদের কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হব, কারণ আমি ওস্তাদ নই, কিন্তু বলব তাহলে ওটা আর্টের কোঠায় পড়েনা। তোমরা বল্‌বে নাম নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই, আমাদের ভালো লাগে, এবং ভালো লাগে বলেই যত বেশী পাই ততই স্ফূর্ত্তি লাগে। যখন দেখি যথেচ্ছ পরিমাণ পাওনা-বিস্তারে তোমাদের কোনো আপত্তি নেই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের ভালো লাগার প্রকৃতি কী। তোমাদেরই মতো

আমারো ভালো লাগে, সেটা লোভীর ভালো লাগা। আর্টিষ্ট অলুব্ধ। সে স্বাদগ্রহণের উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য করে ভালো লাগার অমিতাচারকে অশ্রদ্ধা করে। সোনা জিনিষটা উজ্জ্বল, তার সু-বর্ণটা মনোহর, দুর্লভ খনিজ বলে তার দাম আছে। বসুন্ধরা আপন রত্ন বের করে দেওয়া সম্বন্ধে মিঞা সাহেবদের চেয়ে কম কৃপণ নন। একতাল সোনা এনে ধরা হোলো, তুমি বল্‌লে, বহুৎ আচ্ছা; আর একতাল এলো, তুমি বল্‌লে সোভান আল্লা,—সঙ্গীতের যক্ষভাণ্ডার থেকে তালের পর তাল আস্‌তে লাগল দূন চৌদূন বেগে, বাহবা দিতে দিতে তোমার গলা যায় ভেঙে। মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; কিন্তু সে মূল্য যক্ষ-রাজের খাতাঞ্চিখানার। সে মূল্যের গাণিতিক অঙ্কে আরো আরো আরো চাপিয়ে যাওয়া চলে। সরস্বতীর কমলবনে সোনার পদ্ম আছে; সেখানে লোভীর মতো encore encore করে চীৎকার চলেনা। বেনের দল যতই দুঃখিত হোক, শতদলের উপর আর একটা পাপড়ি চাপানো চল্‌বেনা। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেচে বলেই সে

অপরিসীম। ভাণ্ডারের ধনে আরোর ফরমাস চলে কিন্তু আনন্দের ধনের দিকে তাকিয়ে বলে থাকি, "নিমেষে শতেক যুগ বাসি।" রামচন্দ্র সোনার সীতা বানিয়েছিলেন। সোনার প্রাচুর্য্য নিয়ে যদি তার গৌরব হোতো তাহলে দশটা খনি উজাড় করে যে পিণ্ডটা তৈরি হোতো তার মতো সীতার শোকাবহ নির্ব্বাসন আর কিছু হতে পারত না। রামচন্দ্রকে "থামো" বলতে হয়েছে—কিন্তু ছায়ানটের অক্লান্ত প্রগল্‌ভতার মুখে "থামো" বলবার সাহস আমাদের জোগায় না, তাতে ভুজবলের প্রয়োজন হয়।—এই বার এই তর্ক সম্বন্ধে "থামো" বলবার সময় হয়েছে, অন্তত আমার তরফে। ইতি

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ই চৈত্র, ১৩৪১

পরম পূজনীয়েষু,

আপনি লিখেছিলেন, "আমি বারবার দেখেছি বর ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্টর্ আনন্দ আছে।" কিন্তু সে রাতের আসরের পর আমাকে আপনি যে দুটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছিলেন তাদের এবং এই চিঠি দুটির যথাযথ উত্তর দেবার অক্ষমতা লক্ষ্য করে আপনার ভাষাই আপনার ওপর নিক্ষেপ কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন আমি বুঝ্‌লাম আপনি যে ব্যারিষ্টার হন নি সেটা কেবল নৃপেন্দ্র সরকারের ভাগ্যজোরে, আপনার নিজের কৃতিত্ব তাতে বেশী নেই। আজ তিন চার সপ্তাহ ধরে কি উত্তর দেব ভাবছি। যা জুটেছে তাই গুছিয়ে লিখ্‌ছি।

মনে হয়, কোথায় আমরা একমত প্রথমে জেনে রাখলে কোথায় এবং কতটুকু আমাদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। আর্টের প্রকৃতি revelation এবং revelation-এর গৌরব তার

পরিপূর্ণ ঐক্যে এই মন্তব্যের পর আপনি লিখেছেন, "সেই ঐক্যে থামা বলে একটা পদার্থ আছে চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়।" এই বাক্য থেকে আপনি সঙ্গীতে গতির আনন্দ বাদ দিতে চান না, উপভোগই কর্‌তে চান পরিষ্কার বোঝা যায়। সেদিনকার এবং আরো অন্যদিনের কথোপকথনে, উচ্চ-সঙ্গীত শোনবার সময় আপনার আনন্দময় একাগ্রতায়, এবং বিশেষতঃ প্রথম চিঠির মারফৎ ধ্রুবপদ্ধতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশে উচ্চ-সঙ্গীতের প্রতি আপনার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তার মহিমা, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য ভোগ করবার আগ্রহ ও ক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। অতএব আমার সিদ্ধান্তই ঠিক। যে পথ চলাতেই আনন্দ পায় সে কখনও গতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। যে চিরজীবন গতানুগতিকের স্থাণুভাব বিপক্ষে বিদ্রোহ করে এল তার পক্ষে রাগিণীর চলিষ্ণু রূপ-উদ্‌ঘাটনে অসহিষ্ণু হওয়া অসম্ভব। থামতে আপনার ধর্ম্মে বাধে তাই এই সেদিনও পুনশ্চ ও চার অধ্যায় লিখলেন। আমিও আপনার সমধর্ম্মী, এইখানেই আমাদের যথার্থ মিল। মিলের জোরে আমরা উভয়েই

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একান্ত ভক্ত হয়েও তার চিরাচরিত পদ্ধতির মুক্তি চাই। মুক্তি, মৃত্যু নয়, কারণ বাঁচা মানেই চলা। অনুকৃতির শিকল প'রে বন্দীরাই খুঁড়িয়ে হাঁটে। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত সঙ্গীত মন্ত্র-আওড়ানর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি মুক্তি চাই বলেই আপনাব সঙ্গীত-রচনার ঐতিহাসিক সার্থকতা ও অধিকার স্বীকার করি। সে-মুক্তি আমাদেরই মুক্তি জানি ব'লে আপনার রচনাকে বিদেশী সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করি না; আমাদেরই পরিচিত অন্য সঙ্গীতের পাশে বসাই, তারই সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজি। যখন নূতনের সঙ্গে পুরাতনের গরমিল দেখি তখন মাত্র গরমিলের জন্যই নূতনকে অবহেলা করি না; আমাদের সঙ্গীত-পদ্ধতির শ্রীক্ষেত্রে তাকে ঠাঁই দিই, হরিজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি না। আমার বিশ্বাস, আপনার সঙ্গীতকে সঙ্গীতের হরিজন বল্লেও তার অপমান করা হয় না। ভারতীয় কৃষ্টিরক্ষার ভার যদি এতদিন কেবল পুরোহিত-সম্প্রদায়ের হাতেই থাক্‌ত, তাহলে সংস্কৃতির ধারা এতদিন মরুতেই সারা হত। কিন্তু—হয়নি, হয়নি গো,

হয়নি হারা। এই হরিজনেরাই, পাণ্ডাপূজারীর হাতের বাইরে গিয়েই সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জ্জন করেছে। আমাদের সংস্কৃতির ধারা যদি এখনও নৌবাহ্য থাকে ত' সে ঐ হরিজনেরই কৃপায়। লোক-সঙ্গীতই মার্গ ও দরবারী-সঙ্গীতের কালান্তরে নিজের রক্ত দিয়ে প্রাণ-সঞ্চার করে এসেছে। পরে, অকৃতজ্ঞও হয়েছে সনাতন-পন্থীরা। ইতি-হাসেও প্রমাণ আছে—আকবর-বাদসাহের দরবারে গোয়ালিয়র অঞ্চলের চাল, অর্থাৎ নবপ্রবর্ত্তিত ধ্রুপদ শুনে আবুল ফজল্‌ আফ্‌শোষ জানিয়েছিলেন। সেকালের ধ্রুপদ নাকি হরিজন সঙ্গীত—অর্থাৎ দরবারের অনুপযুক্ত বিবেচিত হত! মাদ্রাজের বড় বড় পণ্ডিত ও ওস্তাদ এখনও তানসেন-প্রবর্ত্তিত উত্তর-ভারতীয় গায়কী-পদ্ধতিকে অহিন্দু, যবনদুষ্ট ও ভ্রষ্ট বলে থাকেন, আমি নিজ কানে শুনেছি। বলা বাহুল্য, আমরা, উত্তর-ভারতীয়রা ঐ মতে সায় দিই না। ডাঃ সুনীতিকুমারের মতো হিন্দুও তানসেন সম্বন্ধে প্রবাসীতে উচ্চ-প্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন! আমাদের মধ্যে অনেকেই তানসেনকে সঙ্গীতের অবতার গণ্য

করেন। আপনি কয়েক শতাব্দী পরে ঐ রকম পদে অধিষ্ঠিত নাও হতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গীত রচনার ও সঙ্গীতে মুক্তিদানের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য কখনও কখনও ধ্রুপদের বিপক্ষে আবুল ফজলের আপত্তির পুনরুক্তি শোনায় বলেই সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার ও কর্ত্তব্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত ও মুক্ত কর্‌তে পারি না। সঙ্গীতের যদি প্রাণ থাকে তবে তার ইতিহাসও থাক্‌বে, যদি তার ইতিহাস থাকে তবে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা, তার সাথে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন রূপ দেবার দায়িত্ব কখনও কোন স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যক্তির ঘুচ্‌বে না, তাকে ভেঙ্গে গড়ার কর্ত্তব্য থেকে কোন স্রষ্টাই অব্যাহতি পাবেন না। আমাদের দেশের বড় বড় রচয়িতা সস্তায় অব্যাহতি পেতে চান্ নি। আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস অনুকরণের তমসায় আচ্ছন্ন নয়। সে যাই হোক্—কোন তুলনা না করে বলছি, আপনার সঙ্গীত-রচনায় এই দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাই।

আপনি নিজে, ভদ্রতাবশতঃ, আপনার সঙ্গীতের কোন উল্লেখ করেন নি। ভালই করেছেন। আমি

উল্লেখ করছি, কারণ, আমি বুঝেছি, মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস যে আপনি সঙ্গীত-রচয়িতা, এবং আপনার রচনার সাঙ্গীতিক মূল্যও আছে। কত বেশী, কত কম, কার তুলনায়, এ সব আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তর্কের খাতিবে এবং আমার মজ্জাগত শান্তিপ্রিয়তার জন্য মেনে নিচ্ছি যে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন্। তা ছাড়া, আপনি যতই নিষ্কামভাবে আলোচনা করুন না কেন, সঙ্গীত সম্বন্ধে আপনার মতামতে আপনাব নিজেব রচনা-পদ্ধতিব ছায়াপাত হবেই হবে। উপরন্তু সেই মতামতকে এক হিসাবে আপনাব সঙ্গীতের ব্যাখ্যা ও সমর্থনও বলা চলে। সাহিত্যে অন্ততঃ দেখেছি যে আপনি নিজেই নিজের একজন উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার!

অতএব মিল হল গতিপ্রিয়তায়, এবং সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার-স্বীকাবে। আব একটি মিলনের ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করছি। আমিও রচনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাবার স্বপক্ষে, কারণ আমি উৎকৃষ্ট ঘরাণার গান শুনেছি। আমাদের সঙ্গীতে অন্ততঃ দুটি বিভাগ আছে। প্রথমতঃ আলাপ, যাতে কথা

নেই কিংবা ব্যবহৃত কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক, এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য রাগিণীর বিকাশ-সাধন। দ্বিতীয়তঃ, বন্দেশী, যাতে শব্দ আছে, শব্দের অর্থ আছে, যদিও রাগিণীর বিকাশ সেই অর্থের সা রি গা মা-য় অনুবাদ নয়। বন্দেশী গানে 'বন্দেশ' (composition) অর্থাৎ রচনার মেজাজটাই (temper, mood) সুরের বিকাশকে ধারণ করে, তার রূপের কাঠামো যোগান দেয়, গতির সীমা নির্দ্ধারণ করে। ধ্রুপদে এই বন্দেশী পদ্ধতির চমৎকার পরিচয় মেলে। কোন ধ্রুপদিয়া (অনেক ধামারিও) গাইবার সময় তান বিস্তার করেন না। এমন কি অযথা বাঁটোয়ারার দ্বারা রচনার সৌকর্য্যকে বিধ্বস্ত করাও ধ্রুপদে প্রশস্ত নয়। যাঁরা পাকা-ঘরাণার খেয়াল গান, তাঁরাও রচনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝে তানের সাহায্যে রচনারই রূপ উদ্ঘাটিত করেন। ভীমপলশ্রীর দুটি বিখ্যাত খেয়াল আছে, 'অব তো সুনলে' ও 'অবতো বঢ়ি বের'। কিন্তু দুটির গঠন-সৌষ্ঠব পৃথক। যে খেয়ালিয়া বন্দেশের গঠন-তারতম্য না স্বীকার ক'রে স্বকীয় প্রতিভারই জোরে ভীমপলশ্রীর ঐশ্বর্য্য দেখাতে তৎপর সে সাধারণ-শ্রোতাকে চমক্ লাগাতে

পারে, কিন্তু ওস্তাদের কাছে তার খাতির নেই। বালাজী বোয়া বিষ্ণু দিগম্বরের মুখে একটি খানদানী (হদ্দুখাঁনি) চালের গানের ঐ প্রকার স্বাধীন বিকাশ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন ব'লে শুনেছি। এবং ব্যতিবেকের জন্য দুঃখপ্রকাশ আমাদেব পক্ষে স্বাভাবিক। যে দেশে বেদের উচ্চাবণ ভ্রষ্ট করলে মহাপাতকী হতে হয় সে দেশে বন্দেশী অক্ষবেব সুবগত সমাবেশ ভঙ্গ কবতে লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই পাড়ে কেন বুঝি না। তাব পব, ঠুংরীতেও নায়ক-নায়িকা আছে, সেগুলি হল বচনাব মূলভাব, যেমন কীর্ত্তনে বিবহ, মান, প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চাবণ কবেন, কী বকম শ্রদ্ধাব সহিত মূলভাবেব ও বচনাব মর্য্যাদা দেন যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে তিনি কখনও আমাদেব গায়কী-বীতিকে স্বাধীনতাব নর্ত্তনভূমি বলতে চাইবেন না। আমাব বক্তব্য হল এই ঃ আমাদেব বন্দেশী গায়কীতে বচনাকে মর্য্যাদা দেওযাই বীতি। এক আলাপিয়া ছাড়া অন্য সব ভাল ওস্তাদেই স্বীকাব করেন যে মর্য্যাদা কেবল শব্দেবই প্রাপ্য

নয়, রাগিণীরও নয়, সুর ও কথা মিলে যে রস জন্মায় কেবল তারই প্রাপ্য। আবার বলি, যখন কোন ওস্তাদ রাগিণীরই বৈচিত্র্য দেখাতে রচনার রূপগত ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধা-নিদর্শনে কার্পণ্য করেন তখন তিনি প্রথাসঙ্গত গায়ক নন্। জোর তাঁকে আলাপিয়া নাম দেওয়া চলে। সেই সঙ্গে অবশ্য একথা বলবারও অধিকার আমাদের আছে যে তাঁর কোন কথা ব্যবহার না কর্লেও বেশ চলত। অতএব রচনার স্বকীয়তার প্রতি গায়কের কাছে আপনি যে দরদ প্রত্যাশা করেন সেটি আপনার প্রাপ্য। আপনি নতুন কিছু চাইছেন না। কেবল জনকয়েক ওস্তাদকে তাদের গোটাকয়েক প্রথা-বিরোধী বদ্ অভ্যাস ভাঙ্গতে অনুরোধ করছেন, তাদেরকে আমাদেরই সঙ্গীত ইতিহাসের অতীত গৌরবই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখানেও আপনি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট নন, বরঞ্চ আগাছা তুলে পুরাতন রাজপথকে পথগম্য করতে প্রয়াসী। এখানেও আমাদের মিল, আমি রাজপথে বেড়াতে ভালবাসি, সুবিধা অনুভব করি।

এইবার বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার গরমিলের ক্ষেত্র জরীপ করা সহজ হবে। ক্ষেত্রটি

সঙ্কীর্ণ ; কিন্তু তার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেব না, যদিও তাই নিয়ে মোকদ্দমা করতে রাজি নই। বিশ্বাস আছে, আপনাকে বুঝিয়ে বল্লে সে জমিটুকু স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দেবেন। এবং প্রতিবেশী হিসেবে আমার বদনাম নেই।

আমার নিজের বক্তব্য হল এই : আলাপে যখন রচনার মত কোন সৌষ্ঠব-সম্পন্ন কথা-বস্তুর দাবী স্বীকার করবার পূর্ব্বোক্ত ধরণের বিশেষ ও জরুরী দায়িত্ব নেই, তখন আলাপের রীতি-নীতি রচনার গায়কী-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হবেই হবে। রচনা হল কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নতুন রস-সামগ্রী। আলাপ কিন্তু প্রাথমিক, রাগিণীর রূপবিকাশই তার একমাত্র কাজ, এখানে না আছে অর্থবাহী কথা, না আছে কথাবাহী অর্থ। আলাপের গন্তব্য নেই, অথচ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা—উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনা। ঐশ্বর্য্য দেখান কোন আর্টিষ্টেরই কাম্য হতে পারে না, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন নিশ্চয়ই ন্যায়-সঙ্গত। রচনায় পূর্ব্ব হতেই ঐক্য দেওয়া আছে—

সেটি রচয়িতার দান; আলাপে তাকে স্থাপনা করতে হবে, এটি হবে গায়কের সৃষ্টি। সেজন্য তার একটি অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। আলাপিয়ার সুবিধাও রয়েছে, রচনার, বিশেষতঃ কথার বাঁধন তাকে মানতে হচ্চে না। ঐশ্বর্য্য দেখানতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেইজন্য নির্ব্বাচন তাকে করতেই হবে। বন্দেশী-গানে শক্তির ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠবরক্ষায়, আলাপে শক্তির ব্যবহার রাগিণীর ক্রমিক বিকাশে, তার জ্ঞানকৃত বিবর্ত্তনে। আলাপই আমাদের pure music। আপনি চিঠিতে আলাপকে বাদ দিয়েছেন। সঙ্গীত বল্‌তে আমি আলাপকেও বুঝি। আর্টের দিক থেকে বন্দেশী বড় কি আলাপ বড় এই প্রশ্নের উত্তর আর্টিষ্টের কৃতিত্ব-সাপেক্ষ এবং শ্রোতার রুচি-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, এ বিচার বিশেষের ওপর নির্ভর করে বলেই তাকে কোন সামান্য বাক্যে পরিণত করা চলে না। কিন্তু আধিমৌলিক বিচারে, ontologically, আলাপকে প্রাধান্য দিতে হয়। সঙ্গীতও একপ্রকার জ্ঞান; প্রথমে কোন জ্ঞানই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না; অথচ স্বাধীন না হলে তার বৃদ্ধি নেই। বৃদ্ধি ও

সম্প্রসারণের জন্য জ্ঞানকে আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হয়, তবেই তার মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। তত্ত্বমূলের পাট করলে পরগাছা যায় মরে, গাছ তখন নিজের ফলফুলে শোভিত হয়ে স্বকীয়তার গৌরব অনুভব করে। জ্ঞানচর্চ্চার এই হল স্বকীয়তা-সাধন। পরের অধ্যায়ও অবশ্য আছে—কিন্তু সেটা গাছে অর্কিড ঝোলানর মতনই। অতএব, আলাপের রীতিনীতি বাদ দেওয়া যায় না সঙ্গীত-আলোচনা থেকে।

ধরুন, ছায়ানটের আলাপ হচ্ছে। ছায়ানটের আরোহী, অবরোহী, তার বাদী, সম্বাদী, তার বিশেষ 'পকড়' দেখিয়ে ছায়ানটের ঘট-স্থাপনা হল। কিন্তু সেইখানে থামলেই কি ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল, তার প্রকৃতি ফুটল? এযে সেই ভক্তের কথা যিনি প্রতিমার মুণ্ডু পরাবার পূর্ব্বেই বলেছিলেন, 'আহা! মা যেন হাঁসছেন'! অন্য ভাষায় বলি—আমার আমিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নেতিবিচারের দ্বারা পার্থক্য-অনুভূতির কি কোন প্রয়োজনই নেই? যে সব যোগীর পূর্ণ সমাধি হয় তাঁদের বেলা তাঁরা আছেন এই যথেষ্ট। সাহিত্যে যেমন, আপনার লেখায়, পরেশবাবু ও

মাষ্টার মশাই। তাঁরা সৎ, এর বেশী তাঁদের সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজনই হয় না। এঁরা পূর্ণ, এঁরা রুদ্ধগতি, আত্ম-সমাহিত, আত্মস্থ, আমাদের নমস্য। এঁরা হলেন শেষের কবিতা। কিন্তু অন্যের পক্ষে বহুর্ভবামি অস্তিত্বের বিকাশেচ্ছা নয় কি? আমি হব—বহু হব—এইটাই আর্টিষ্টের প্রাণের কথা —আমি আছি, যেমন যোগীর। বহু হওয়াই যখন আর্টিষ্টের ধর্ম্ম, যখন সে যে-বস্তুর অন্তর উদ্‌ঘাটিত (reveal) করতে চায় তার প্রকৃতি বুঝতে কোন substance কি গুপ্তসত্তা বোঝে না, process-ই বোঝে, তখন revelation-এর জন্যই mere statement করে নীরব থাকলে তার চলে না। অতিবিক্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি হল—ক-বস্তু খ-বস্তু নয় প্রমাণ করা। যেটুকু না হলে নয় তারই আভাস দিয়ে মুখবন্ধ কর্‌লে আর্টিষ্টের বহু হবার প্রবৃত্তিকে বঞ্চিত করা হয়। সাধারণের বেলাতেও তাই—সাধারণ শ্রোতাও যখন শুনছে তখন সে আর্টিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে বহু হচ্ছে। বহুলতাকে নয়, বহু হবার প্রবৃত্তিকে খাতির না কর্‌লে আর্টকে ঘৃণা করা হয়। বহুলতার মূলে

আছে বহুর্ভবামির তাগিদ। বিশেষতঃ আমাদের আলাপে। আমাদের আলাপ অবিরাম গতিশীল, তার প্রকৃতিই হল procession। অতএব ঠিক তার revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing।

এখন ছায়ানটের আলাপ চলুক। প্রথমেই সারে, গমপ, পরে, গমরে সা নেওয়া হল, তারপর আরোহীতে সারে, রেগা, গামা, মাপা নিয়ে, ধৈবত আন্দোলিত করে গলা ওপরের সুরে পৌঁছল, অবরোহীতে ঐ প্রকার শুদ্ধ স্বরগুলি ব্যবহার করে, "পারে গামা পা" এই মিড়টি নিয়ে রিখাবে গলা থামল—কোন স্বরই বিবাদী হল না। তবুও কি ছায়ানট রাগিণী গাওয়া হল? আমার মতে এখনও হল না, হল কেবল ছায়ানটের blue print-টুকু, ডিজাইন-টুকু। শ্রমবিভাগের ফলে স্থপতিবিদ্যায় ডিজাইনের কদর বেড়েছে জানি, কিন্তু নীল রং-এর কাগজে সাদা আঁচড় দেখে বসবাসের সুখভোগ কি স্বাভাবিক? আপনি বলবেন—কল্পনার উদ্রেক করানই আর্টিষ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু কল্পনাও নানা জাতের, ডিজাইনারও নানা

রকমের। সেইজন্য, নীচের ও ওপরের তলার, স্নানের ঘরের, ম্যয়, সিঁড়িরও cross-section চাই, এলিভেশনের লোভ দেখিয়ে ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। তার ওপর চাই নির্ম্মাণ, চাই গৃহ-প্রবেশ, চাই বসবাস, এঘরে বাসর, ওঘরে মৃত্যু, এ জানলা দিয়ে লবঙ্গলতিকার উগ্রগন্ধ পাওয়া, ওটা দিয়ে নারকেল গাছের সোনালী ফুল থেকে গাঢ় সবুজ ডাবের পরিণতি দেখা, এ দেয়ালে সিঁদুরের দাগ, ওটায় খুকীর আঁচড়, এ পর্দ্দা মেজদির, ওটা সেজ বৌমার তৈরী—সব চাই, তবেই না গৃহ! উপমা ছেড়ে দিই—শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্গীতা শোনাতে চাই না। ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা কথাটি ঠিক নয়, কারণ আলাপের প্রাণই হল গতি) বিস্তারের দ্বারা তাকে মুক্তি দিতে হবে।

আলাপবিস্তার অনেকটা ভারত-সাম্রাজ্যের non-regulated area-র মতন। তার রীতি-নীতি, সুনির্দ্দিষ্ট পন্থাও আছে, তবে সেটি বন্দেশী-গানে রাগিণীর রূপ প্রকাশের নয়। হয়ত আপনি ছাড়া আর কেউ সেই নিয়মকে ভাষায় ব্যক্ত

কর্‌তে পারে না। তবে পন্থা আছে জানি, কারণ শুনেছি। প্রথমে ধীরে, গমক ও মীড়ের সাহায্যে, তান না দিয়ে, তারপর মধ্যলয়ে খুব ছোট তানের সঙ্গে মীড় মিশিয়ে, তারপর, সব রাগে নয়, গোটা কয়েক রাগে দ্রুত ও বিচিত্র কর্ত্তবের দ্বারা আলাপ করা হয়। সাধারণতঃ আলাপে, খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পার তান ব্যবহৃত হয় না। অন্য অলঙ্কার, যেমন ছুট্ মূর্চ্ছনা প্রভৃতিরও প্রয়োগ চলে। তারপর বাণী আছে। সেই বাণীর অবলম্বনেই বোল্-তান দেওয়া হয়। এই হল আলাপের পন্থা—যার প্রধান কথা—পরম্পরা। মীড়ের পরই, জমীন্ তৈরী হতে না হতেই, তান-কর্ত্তব চলে না। সবই আস্‌তে পারে, আস্‌বেও, তবে যথাসময়ে। এই-খানেই নির্ব্বাচনক্রিয়া। বড় আলাপিয়ার পদ্ধতি সুসঙ্গত—তার নির্ব্বাচন যথেচ্ছাচারিতা নয়। ভাল ঘরাণায় পথটি পাকা। যদি কোন ওস্তাদ প্রতিভার জোরে আরো ভাল রাস্তা তৈরী করে তাহলে তাকে ও তার পথকে কদর করবই করব। আলাপে এইপ্রকার প্রতিভার সাক্ষাৎ-লাভ দুর্লভ, আলাবন্দে খাঁর ঘরাণা ভিন্ন, তবে

অন্য গানে আবুল করিমকে আমি খুব উচ্চস্থান দিই। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, যে আবুল করিম ফৈয়াজের মতন ঠিক ঘরাণা গাইয়ে নয়। সে অনেক সময় বন্দেশ ভুলে যায়—কিংবা দু'একটি লাইন গায়, বড় ওস্তাদে তাকে সেজন্য ঠাট্টাও করে, হিন্দোলে শুদ্ধ মধ্যম দেয়, ভৈরবীতে শুদ্ধ পর্দা লাগায়, গায় নিজের মেজাজে—কিন্তু সে মেজাজে কী মজা! এম্‌দাদ হোসেন কি ঘরাণা বাজিয়ে ছিলেন? কিন্তু এত রসিক সেতারী জন্মায় নি। এমদাদ্ খাঁ নিজেই ঘরসৃষ্টি করে গিয়েছেন—এখন সারা ভারতে এম্‌দাদী চালই চল্‌ছে। সেনীয়া-সেতারীর বাজিয়ে হিসেবে খাতির কম।

আলাপে পরম্পরার রীতি ঘরাণা হিসেবে ভিন্ন হলেও তার নীতি বোধ হয় এক ভিন্ন দুই নয়। প্রথম পদ দ্বিতায়কে পথ দেখাবে, দ্বিতীয় তৃতীয়কে—এই চলবে। মূল অবশ্য ছায়ানট, অর্থাৎ অন্য রাগিণী নয়। মূলটাই ঐক্য-বিধায়ক। এখানে ঐক্যজ্ঞান শেষ-জ্ঞান নয়, এখানে ঐক্য সম্পূর্ণতার নামান্তর নয়। মূলগত ঐক্য বিস্তারের মধ্যেই ওতঃপ্রোত

রয়েছে। গতিশীল ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেণীর ঐক্য এই ধরণের হতে বাধ্য। যদি বৃত্ত হিসেবে ধরেন, তাহলে ক-বিন্দু থেকে বেরিয়ে সেই ক-বিন্দুতে ফিরে আসাই হবে গতির নিয়তি। কিন্তু গানের বিশেষতঃ আলাপের গতিকে বৃত্তাকারে যদি পরিণত করতেই হয়, তাহলে asypmtote-এই করা ভাল। যে অসীম পথের যাত্রী তাকে ঘরের সীমানায় আবদ্ধ রাখলে কি ক্ষতি হয় আপনি নিজে জানেন। আপনিই না স্কুল পালাতেন? আপনিই না স্বাধীন দেশে বছরে অন্ততঃ একবাব ঘুরে আসেন? বনের হরিণ গানটি আমার কানে ভেসে আসছে। গতিরাগের গানকে আপনি আলো-ছায়াব প্রাণ বলেছেন। আকাশে আজ হঠাৎ মেঘ করেছে, জোরে হাওয়া চলছে,—মেঘ ও আলো ছক্ আঁকতে আঁকতে কোথায় যাচ্ছে—কে জানে! এই ত আমাদের আলাপ!

লোকে অস্থায়ীকে (কথাটা স্থায়ী, উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্থায়ী হয়েছে) একটু ভুল বোঝে। গানের কোন দুটি চরণ (phrase) এক নয়। আলাপ যখন সুরু হয় তখনকার প্রথম চরণ আর

ঘুরে এসে যেখানে স্থিতি সেই 'প্রথম' চরণ এক বস্তু নয়। এমন কি আরোহীর স্বর আর অবরোহীর স্বর এক নয়—মালকোষে ওঠবার সময় ধৈবত কোমলের একটু বেশী, নামবার সময় সত্যই কোমল, তেমনি জৌনপুরীর ধৈবত আরোহীতে কোমলের চেয়ে একটু চড়া, অবরোহীতে কোমলই। ধ্রুপদের অস্থায়ী ও সঞ্চারী, অন্তরা ও আভোগী কি সমধর্ম্মী? উঁচু অক্টেভের ছক্ কি নীচু অক্টেভের ছকের পুনরাবৃত্তি? কানাড়ার সা রে গা-কোমল কি মা পা ধা-কোমলের হুবহু নকল? অথচ মধ্যমকে সুর করলে তাই হয়, অবশ্য tempered scale-এ, সেই জন্যই ত হিন্দুস্থানী গান হারমনিয়মের সঙ্গে গাওয়া চলেনা। গানে কেন, সর্ব্বত্রই, যেখানে জীবন সেইখানেই এই প্রকার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। আপনি নিজেই লিখেছেন, জীবন মানেই নব নব রূপের প্রকাশ; অবশ্য সৃষ্টির মধ্যে unity আছে, কেবলই বিবর্ত্তন নয়, কিন্তু সেটি মূলের, পূর্ব্বেই বলেছি। আমি ইতিহাসে dialectic process বাধ্য হয়ে স্বীকার করি। জোর

করে রামরাজত্বে ফিরে যেতে পারি কি? চরখা ঘুরুলেই কি উপনিষদ লেখা হয়, না মানুষে আপনা হতেই তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ওঠে? A Yankee at King Arthur's Court হাঁসবার সামগ্রী।

আমার বক্তব্য হল এই ঃ—পরিশেষে ঐক্য চাইতে তিনিই পারেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অতীত। ইতিমধ্যের অধিবাসীরা যখন শেষের ঐক্য চান্ তখন জীবনের organic process-কে একটা মনগড়া অসীম উদ্দেশ্যের উপায় বিবেচনা করেন। আমার সন্দেহ যে আপনি আলাপ সম্বন্ধে teleologically চিন্তা করেছেন। যে জিনিষ চলছে, চলতে চলতে পথ কাটছে, চলিষ্ণু হয়েই পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে, তার আবার শেষ কোথায়?

আলাপের সুরু হল সীমার মাঝে। তারপর মূল বাঁচিয়ে, দুধারের সীমার মধ্য দিয়ে তার গতি, অসীমের দিকে। দিক্ কথাটি লেখা উচিত হলনা, কারণ অসীমের দিক নেই, organic process-এরও নেই। ব্যাপারটি সাদি কিন্তু অনন্ত। যাওয়াটাই

তার মজা, তার adventure। এই শেষহীনতাই তার জীবন। তবে এ জীবনেরও ধর্ম্ম আছে।

মূল বাঁচাবার পরই যাত্রা সুরু হল। ছায়ানটের এই তানে দেখুন বিলাবল, আবার অন্য তানে শুনুন কল্যাণের অঙ্গ। একবার মাত্র তীব্র মধ্যম ছোঁয়া হল বেশী নয় সামান্য, আর একবার পঞ্চম থেকে মীড় দিয়ে রিখাবে নামল, আবার তীব্র গান্ধার—এই হল কল্যাণের আভাস। অতএব কল্যাণ ঠাটের যত রকম রাগিণী আছে তার সঙ্গে ছায়ানটের সাদৃশ্য দেখান চাই—কারণ ছায়ানট কি নয় তাও দেখাবার প্রয়োজন আছে। সেই রকম বিলাবল ঠাটের রাগিণী, বিশেষতঃ আলাহিয়ার সঙ্গে তার পার্থক্যও রয়েছে। অনেকটা endogamy ও exogamy-র সম্বন্ধের মতন, যে জন্য সুপাত্র খুঁজতে বাজার উজাড় করতে হয়। ছায়ানটকে কত হাত থেকে বাঁচাতে হয় ভাবুন—কামোদ, শ্যাম, কেদার, হাম্বীর, গৌড়-সারঙ্গ—সব গণ্ডীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ক এক একবার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। কিন্তু আবার ঘরে এল জাত বজায় রেখে। এই মেশার ভেতর স্বকীয়তা বজায়

রাখা তান-কর্ত্তবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। রাগিণীর যত বন্ধু, বন্ধুদের সঙ্গে যতপ্রকার মেলা মেশার উপায় আছে তত প্রকারের তান সম্ভব। এখন দেখছি, সতীনের উপমা দিলেও মন্দ হত না।

তান-কর্ত্তবের অন্য কাজও আছে—তার উল্লেখ মাত্র করছি। গম্‌কীতে গাম্ভীর্য্য, মীড় ও আশে মাধুর্য্য, মুড়কীতে অলঙ্কার, জমজমায় ঐশ্বর্য্য সূচিত হয়। তবে বুঝে তান ছাড়তে হবে—নির্ব্বাচনের হাত থেকে রেহাই নেই। বন্দেশী গানে রচনার মেজাজ, এবং আলাপে সুকুমার পারম্পর্য্যই হল নির্ব্বাচনের principle। ঘরাণায় নির্ব্বাচনের দায়িত্ব সহজ করে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়াটি কঠিন বলে তান বর্জ্জন করাটা স্নানের টাবের জলের সঙ্গে খোকাকে নর্দ্দামায় ফেলে দেবারই মতন।

আপনি সুন্দরীর সঙ্গে রাগিণীর তুলনা করেছেন—সেই হিসাবে তানকে অলঙ্কার বলেছেন। প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাক্‌রার সখ মেটাতে বারণ করেছেন। বেশ, মেটাব না। কিন্তু এই সংক্রান্তে আপনারই একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিই। আপনি মুখে বলেছিলেন, "বেশ, সব অলঙ্কারই চাই, কিন্তু একটি

গানে কেন? আলাদা আলাদা গানে তার উপযোগী গহনা পরাও।” তাহলে, কি দাঁড়াল দেখছেন! হিন্দু সমাজ যে ভেঙ্গে যাবে! আত্মহত্যার হিড়িক পড়বে! কারণ, একই সময় কোন সুন্দরী তাঁর সিন্দুকের সব গহনা পরেন না, এবং একই সময় একটি সুন্দরীকে সব গহনা পরানও যায় না। বাঙ্গালী-সমাজে সুন্দরীর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সত্য কথা এই, আলাপে ঐ প্রকার কোন ‘একই সময়’ নেই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তই পিচ্ছিল।

ইতিপূর্ব্বে পরম্পরা ও adventure কথা দুটি ব্যবহার করেছি। লিখতে লিখতে আরো অন্য কথা মনে হচ্ছে। ঐ সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই। আপনি লিখেছেন, “ঘড়ি দেখিনি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল একঘণ্টা পেরোল না।” আমারও বিশ্বাস, গান শোনবার সময় কলের ঘড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়। নাগরার মতন ঘড়ি বাইরে রেখে আসা উচিত। রক্তের দোলায় যে সময় দোলে সেই organic time-এর সঙ্গেই গানের সম্বন্ধ আছে। অবশ্য রক্তের দোলটাই গানের দোল ভাবলে ভুল করা হবে। আমি

organic কথাটি biological অর্থে ব্যবহার করছি না। অনেকের পক্ষে সঙ্গীত-উপভোগটা নিতান্তই জৈব। বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ-উপলক্ষে সঙ্গীতকে appetiser হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শরীর অসুস্থ হলে সব গানই দীর্ঘসূত্র, সুস্থ থাকলে সবই ক্ষণিকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। থিয়েটার-সিনেমার গান ভাবুন। সে গান শুনতে পারি না, একান্তই জৈব বলে। সেখানে নায়কের প্রত্যাখানের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা কাঁদতে থাকেন, এবং তাঁর ফোঁশ-ফোঁশানির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বেহাগ শুনতে হয়। কিন্তু আমরা সকলে মিলে কী পাপ করেছিলাম ?

আপনি নিশ্চয় 'রক্তের দোলা' ঐ ভাবে লেখেননি। আমি যে অর্থে organic time ব্যবহার করছি সেটি mechanical time-এর বিপরীত। এই দুটোর মধ্যে স্বতঃই একটা বিরোধ রয়েছে—আপনার 'কিন্তু' কথাটিতেই সেটি পরিস্ফুট। মানুষ ঘড়ি মানতে চায় না। খেয়ালের বশেই মানুষ সাধারণতঃ সময় মাপে। Utility-র রাজ্যে, কলেজে, ঘড়ি। বৃদ্ধারা বলেন, 'দাঁড়াও বাছা, বলছি

করে, পুঁটু তখনও জন্মায়নি।' চাষাভূষোরা স্মরণীয় ঘটনা, ফসল বোনা, কাটা, প্লাবন ও জলকষ্ট দিয়েই সময় মাপে! ফ্যাক্টরী যে ফ্যাক্টরী, সেখানেও মজুররা যে তাই করে সকলেই জানেন, এবং এই সাধারণ জ্ঞানটি পণ্ডিতে অনেক অঙ্ক কষে ছক্ এঁকে উপলব্ধি করেছেন, প্রভুরা এখনও করেন নি। শ্রমিকের ক্লান্তি আসে আগ্রহের অভাবে। Mechanical time হল ঘড়ির কাঁটা মাপা ঘণ্টা, তার মাপ মিনিট ও সেকেণ্ডের যোগ-বিয়োগে। এবং যেখানে যোগ-বিয়োগই উপভোগের মাত্রা নির্দ্ধারণ করে সেইখানেই গান থামবে কবে প্রশ্নটি শ্রোতাকে উত্যক্ত করে। ক্লান্ত শ্রমিকরাই বিকেলের দিকে ছুটির জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু সহজ আগ্রহ ও কালের হারবৃদ্ধির মাপ নেই, ছন্দ আছে, সে ছন্দ সংখ্যামূলক নয়, অর্থাৎ তার পিছনে matter কি motion-এর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নেই; আছে সেই সব ঘটনা ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যার দরুণ বৃদ্ধির হার কমে বাড়ে, তার অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। এর তাগিদ থামবার নয়, বাড়বার। অবশ্য এই প্রকার কালাতি-পাতকে development বলাই ভাল। বাংলায় কি

প্রতিশব্দ ? এক কথায়, mechanical time-এর স্বভাব হল পুনরাবর্ত্তন, organic time-এর হল ঐতিহাসিক উদ্‌ঘাটন। প্রথমটি হল, succession of mathematically isolated instants, দ্বিতীয়টি accumulation of connected experiences, অতএব তার ক্রিয়া cumulative। প্রথমটি গোড়ায় ফিরে আসতে পারে—ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিলে day-light saving হয়—কিন্তু দ্বিতীয়টি চলছে নিজের গোঁ ভরে, তার পরিণতি নেই। প্রথমটিতে যা হয়ে গিয়েছে সেটি গত, ভূত সত্যকারের ভূত, দ্বিতীয়টিতে যা হয়েছিল সেটি বর্ত্তমানে রয়েছে, আবার ভূত ও বর্ত্তমান মিলে ভবিষ্যৎকে তৈরী করবার জন্য সদাই প্রস্তুত। এগিয়ে চলবার খাতিরে, ভবিষ্যতের জন্য, organic time সব করতে পারে, নতুন, রবাহূত, অনাহূতকে বরণ করতেও সে রাজি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আলাপের কাল organic—যে-দেশে ঘড়ির dictatorship সে দেশের সঙ্গীতের কাল mechanical হয়ত হতে পারে, ঠিক জানি না। ভাগ্যিস আমরা অসভ্য !

আমি বলছি, আলাপের কালকে ঘড়ির কাঁটা, এমন কি রক্তের যান্ত্রিক হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাণ করা যায় না। আলাপ যে বরফের গোলার মতন বাড়তে বাড়তে চলেছে। রাগিণীর রূপ যে কেবলই উন্মুক্ত হতে হতে চলেছে। আপনি বলছেন reveal করা চাই, খুব খাঁটি কথা, আলাপই ত রাগিণীর (রচনার কথা আলাদা) সত্যকারের unfolding—চীনেদের scroll-painting-এর মতন—আলাপই সত্যকারের ইতিহাস—তাই প্রতিমুহূর্ত্তের ইতিহাস। অবশ্য, রাগিণীরই ইতিহাস—গায়কের গলা সাধার ইতিহাস নয়। রাগিণী বলে পৃথক বস্তু নেই—প্রকাশেই তার অস্তিত্বস্ফুরণ।

এই ভাব থেকে আপনার ব্যবহৃত অনিবার্য্য কথাটির বিচার চলে—তার তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। অন্য সব আর্টে অনিবার্য্য সমাপ্তি আছে ইঙ্গিত করেছেন। মানি। কিন্তু প্রত্যেক আর্ট-বস্তুর সময় যখন organic অর্থাৎ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, তখন একই নিয়মে সব আর্টের অনিবার্য্য সমাপ্তি স্থিরীকৃত হবে কি করে? সাহিত্যই ধরা যাক—রামায়ণ ও রঘুবংশের সমাপ্তি কি এক নিয়ম মানে? Henry IV আর Macbeth-এর চাল কি এক কদমে?

Bernard Shaw ও তাঁর দেশবাসী Sean O'Casey-র নাটক কি একই হারে একই স্থানে থামে? Brothers Karamazov একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, Fathers and Chidren-ও তাই, প্রথমটিতে একদিনের ঘটনাই ৪০০।৫০০ পৃষ্ঠা জুড়ে বসে আছে, তার পর গল্প দ্রুত চলল, শেষ বেশও ঠিক নেই, দ্বিতীয়টিতে একটি চমৎকার ছেদ রয়েছে। আজকালের নভেলিষ্ট (Preistley নয়) Proust ও Joyce-কে আপনার ভাল লাগে কিনা জানিনা— কিন্তু তাঁদের লেখার সীমা কোথায়? দুজনের নভেলকে সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— যেন counterpoint-এর খেলা। উপমাটা উপযুক্ত; দুজনেই stream of consciousness নিয়ে ব্যস্ত, দুজনেরই কারবার স্মৃতির উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া, কেউই exhibit করছেন না, reveal-ই করছেন। আপনারই গোরা ও চার-অধ্যায় ধরুন, শেষেরটার লয় দ্রুনে, যেন hectic hurry-তে, যেটি তার বিষয়বস্তুর নিতান্ত ও অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু গোরার চাল কি ভারী নয়? যেন গজগামিনী! আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ভাল মন্দ বিচার

করছিনা—দেবী অশ্বেই আসুন, নৌকাতেই আর গজেই আসুন, দেবী হলে পূজো করব—তাতে কোন ত্রুটি পাবেন না। আমি বলছি, এক সাহিত্যেই অনিবার্য্য সমাপ্তির সীমানা, রীতি-নীতি ভিন্ন ভিন্ন। 'চার-অধ্যায়' বাঁশী বাজিয়ে শেষ করলেন, আর গোরা লিখতে তু'ভলুম লাগল—কেন? চার-অধ্যায় পাঁচ-অধ্যায় হয়না যেমন, গোরাও তেমনি চার অধ্যায়ে শেষ হয়না।

ছবি ধরুন, একখানা রাসলীলার ছবি আছে, রাজপুত কলমের। মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা, চার ধারে গোপিনীর দল। যদি গোনা যায় তাহলে একমুখ দেখে দেখে দর্শকের চোখে ও মনে সহজেই ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু ছবিটার ধর্ম্মই ভিন্ন, কৃষ্ণ-রাধা যুগ্ম-সমাহিত, এই বিভোর ভাবটি সংখ্যার পারিপার্শ্বিকে ফুটে উঠেছে ভাল। ছক্ হল ডিমের আকারের—যার রেখা ধরে দেখলে চোখ পিছলে যায়, কারুর মুখ দেখবার জন্য দাঁড়ায় না, সোজাসুজি কেন্দ্রস্থ নায়কনায়িকায় অবস্থিত হয়। এখানে সংখ্যার উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য দেখান নয়, মধ্যকার চরিত্রকে অবকাশ দেওয়া। অবকাশ দেওয়া যায় ফাঁক

রেখে, যেমন জাপানী চিত্রকর করেন, আবার অবকাশ দেখান চলে সংখ্যারও সাহায্যে, যেমন টিন্‌টরেটো একাধিক ছবিতে করেছেন। এখানে সংখ্যার মূল্য বহু নয়, statistical unity মাত্র; ব্যক্তিগত চরিত্রের অভাবে মধ্যস্থ রূপ বিকশিত করবার জন্য সংখ্যা তখন মুক্ত আকাশের সামিল। সংখ্যাও এক প্রকার relief। Grouping-এর সাহায্যেও এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। বলা বাহুল্য, ছবির সঙ্গে গানের তুলনা করছি না, আমি কেবল রূপের সঙ্গে সংখ্যার ও সীমানার উদ্দেশ্য-অনুযায়ী পার্থক্য প্রতিপন্ন করছি। মোদ্দা কথা, শেষ হবার অনিবার্য্যতা উদ্দেশ্য-মূলক। আলাপেব উদ্দেশ্যই যখন আলাদা (উদ্দেশ্য অর্থে ধৃতি বলছি) তখন বন্দেশী আর্টের অনিবার্য্যতার নিয়মাবলী কি এখানে প্রযোজ্য? তাই বলে নির্ব্বাচনের দায়িত্ব নেই—একথা বল্‌ব না। পূর্ব্বেই লিখেছি আমি dialectic process মানি। লেনিন্‌ এরই একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন (সঙ্গীতে লেনিন্‌! কেন নয়? তিনিও দার্শনিক ছিলেন, তিনিও দর্শন বলতে making history বুঝতেন,

interpreting it নয়, তাঁরও মন গতিশীল ছিল)—তত্ত্বটি হল এই যে quantity থেকেই quality-র পরিবর্ত্তন হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সংখ্যা আর গুণের মধ্যে বেশী ফারাক্ নেই। এই সম্পর্কে আপনার বন্ধু—Otto Kahn-এর একটি গল্প মনে পড়ল।

একবার Cecil de Mille, Otto Kahn-কে তাঁর আঁকা ছবি The King of Kings দেখাতে নিয়ে যান। কথোপকথনটি Beverley Nichols লিপিবদ্ধ করেছেন।

de Mille—এই দৃশ্যটিতে কত জন লোক আছে ভাবেন?

Kahn—ধারণাই নেই।

M—আড়াই হাজার, ভাবছেন কি!

K—কিছুই নয়।

M—আপনি highbrow.

K—Velasquez-এর Conquest of Breda দেখেছেন? দেখলে মনে হবে পিছনে লাঠি সড়কির বন গজিয়েছে। যদি গোনেন, তবে টের

পাবেন যে মোটে আঠারটি।......

Velasquez was an artist.

গল্পটি আমার বিপক্ষে যাচ্ছে না। এই ছবিটারই একটি চমৎকার বিশ্লেষণ পড়েছিলাম—বোধ হয় Harold Speed-এর লেখায়। বইটাতে ওই ছবিটার রেখা-রচনাও দেওয়া আছে। দেখে ও পড়ে বুঝেছিলাম যে সম্মুখের তেরছা রচনার relief দেবার জন্য ওই সরল সমান্তরাল রেখার বাহুল্য। এখানেও সংখ্যা, আবার De Mille-এর ছবিতে সংখ্যা। প্রথমটিতে সংখ্যা গুণ হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়টিতে হয়েছে ভার, ক্রুশেরও অধিক। অতএব সংখ্যার নিজের কোন দোষগুণ নেই—বেশী হলেই থামবার তাগিদ নেই। এসব ক্ষেত্রে অনিবার্য্যতা উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং রীতির ওপর নির্ভর করছে। এখানে সীমানির্দ্ধারণের কোন natural law নেই। আমি কোন natural law-ই মানি না।

একটি অনুরোধ করে চিঠি শেষ করি। যে ভাল সাড়ী ও গহনা পরতে জানে তাকে একই সময় একের বেশী দুটি পরতে হয় না। কিন্তু রোজ রোজ একই সাড়ী গহনা পরলে সেই

সুন্দরীকে কি ভাল দেখায়? সুন্দরীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। আপনি যতই সৌন্দর্য্যের connoisseur হন্ না কেন, নারীর সাজসজ্জা সম্বন্ধে নারীদের মতই শিরোধার্য্য। সে যাই হোক - আপনার অভিমতটি ছাপিয়ে দেব? অনেকেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করবেন—কেবল Bengal Stores-এর ছাড়া।

অনেক কিছু লিখলাম। পত্রটি সঙ্গীতের আলাপের মত'ই ধরে নেবেন। গান গাইতে জানি না, জান্‌লে চিঠিটাও হয়ত ছোট হত।

পত্রের উত্তর চাই। অনেক মিল আছে বলেই গরমিলটা সাহসী হয়ে প্রকাশ করলাম। আমি তর্ক করিনি, আপনাকে হারাতেও চেষ্টা করিনি। আপনার কথাবার্ত্তায় ও চিঠিতে যে নতুন আভাস পেয়েছি তারই ফলে আমার চিন্তাধারা খুলে গিয়েছে। সে-ধারা আপনার সৃষ্টি হলেও তার দিক্‌নির্ণয় ও বহতার ওপর আপনার কোন হাত নেই। ওটুকু আমার দোষ।

প্রণত

ধূর্জ্জটি

২৫শে মার্চ, ১৯৩৫

কল্যাণীয়েষু

অর্জ্জুন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ রেখে শরসন্ধান করেছিলেন। তুমিও আমার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সৌজন্য রেখে। তাই হার মানতে মনে আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বাদ প্রতিবাদ চলচে তৎপ্রসঙ্গে হার-জিৎ শব্দটা ব্যবহার অসঙ্গত হবে। বলা যাক্, আলোচনা। উপসংহারে তোমার মত তোমারি থাকবে, আমারো থাকবে আমারি। তাতে কিছু আসে যায়না, কেননা সঙ্গীতটা সৃষ্টির ক্ষেত্র,—যারা সৃষ্টি করবে তারা নিজের পন্থা নিজেই বেছে নেবে—পুরানো নতুনের সমন্বয় তাদের কাজের দ্বারাই, বাঁধামতের দ্বারা নয়।

তুমি বলচ ভারতের ধ্রুপদী সঙ্গীতসম্বন্ধে তোমার প্রধান মন্তব্য আলাপ নিয়ে। ও সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। আলাপের উপাদানরূপে আছে বিশেষ রাগরাগিণী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা

পূর্ব্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দ্দিষ্ট রূপ পায়নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এ স্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই, যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিষ্ট হিসাবে বলব ধন্য, যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটাকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন তাঁকে গীতবিদ্যা-বিশারদ বল্‌তে পারি কিন্তু আর্টিষ্ট বলতে পারিনে—অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বল্‌তে পারি কিন্তু কালোয়াৎ বলতে পারবনা। কালোয়াৎ অর্থাৎ কলাবৎ। কলা শব্দের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব, সেই সীমা, যেটা রূপেরই সীমা। সেই সীমা রূপের আপন আন্তরিক তাগিদেই অপরিহার্য্য; প্রদর্শনীতে সীমা অপরিহার্য্য নয়, সেটা কেবলমাত্র বাহিরের স্থানাভাব বা সময়াভাব বশতই ঘটে। আলাপ যদি রাগিণীর প্রদর্শনীর দায়িত্ব নেয় তাহলে সেই দিক থেকে বিচার করে তাকে প্রশংসা করাও চলে। যে দুর্ব্বলাত্মা পাণ্ডিত্যের ভারে অভিভূত হয় সে প্রশংসা করেও থাকে; সে লুব্ধ মুগ্ধ ভাবে মনে করে অনেক পাওয়া গেল, কিন্তু “অনেক” নামক ওজনওয়ালা

পদার্থই কলা বিভাগের উপদ্রব—যথার্থ কলাবৎ তাকে তার মোটা অঙ্কের মূল্য সত্ত্বেও তুচ্ছ করেন। অতএব আলাপের কথা যদি বলো তবে আমি বলব, আলাপের পদ্ধতি নিয়ে কেউবা রূপ সৃষ্টি করতেও পারেন কিন্তু রূপের পঞ্চত্বসাধন করাই অধিকাংশ বলবানের অভ্যাসগত। কারণ, জগতে কলাবৎ "কোটিকে গুটিক মেলে," বলবতের প্রাদুর্ভাব অপরিমিত। বহুসংখ্যক ফুল নিয়ে তোড়া বাঁধাও যায় আর তা নিয়ে দশ পোনেরোটা ঝুড়ি বোঝাই করাও চলে। তোড়া বাঁধতে গেলে তাব সাজাই বাছাই আছে, বাদ দিতে হয় তার বিস্তর। তোড়ার খাতিরে ফুল বাদ দিতে গেলে যারা হাঁ হাঁ করে ওঠে ভগবানের কাছে তাদের পবিত্রাণ প্রার্থনা কবি। অতএব, আলাপের দরাজ পথ বেয়ে কোন গায়ক সঙ্গীতের প্রতি কী রকম ব্যবহার করলেন সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত নিয়েই বিচার চলে। আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার কবা কঠিন : তার কারণ, দৌড়তে দৌড়তে বিচার করতে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তাতে যে রস পাওয়া যায় সেইটে নিয়ে তারিফ করা চলে কিন্তু সমগ্রকে সুনির্দ্দিষ্ট করে দেখব কী

উপায়ে? তানসেনের গান হোক, বা গোপাল নায়কেরই হোক তারা তো নিরন্তর-বিস্ফারিত মেঘের আড়ম্বর নয়; তারা রূপবান, তাদেরকে চারদিক থেকে দেখা যায়, বার বার বাজিয়ে নেওয়া যায়, নানা গায়কের কণ্ঠে তাদের অনিবার্য্য বৈচিত্র্য ঘটলেও তাদের যে মূল ঐক্য, যেটা কলার রূপ এবং কলার প্রাণ, মোটের উপরে সেটা থাকে মাথা তুলে। আলাপে সে সুবিধা পাইনে বলে তার সম্বন্ধে বিচার অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। যদি কোনো নালিশ ওঠে তবে সাক্ষীকে পাবার জো নেই।

আয়তনের বৃহত্ত্ব যে দোষের নয় এ সম্বন্ধে তুমি কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েচ। না দিলেও চলত, কারণ আর্টে আয়তনটা গৌণ; রূপ বড়ো আয়তনেরও হতে পারে ছোটো আয়তনেরও হতে পারে, এবং অরূপ বা বিরূপ ছোটোর মধ্যেও থাকে বড়োর মধ্যেও। বেটোফেনের "সোনাটা" যথেষ্ট বহরওয়ালা জিনিষ, কিন্তু বহরের কথাটাই যার সর্ব্বোপরি মনে পড়ে, জীবে দয়ার খাতিরেই সভা থেকে তাকে যত্ন সহকারে দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। মহাভারতের

উল্লেখ করতে পারতে, আমাদের দেশে ওকে ইতিহাস বলে, মহাকাব্য বলে না। ও একটি সাহিত্যিক galaxy। সাহিত্যবিশ্বে অতুলনীয়, ওর মধ্যে বিস্তর তারা আছে, তাবা পরস্পব সুগ্রথিত নয়, অতি বৃহৎ নেবুলার জালে জালে তারা বাঁধা, আর্টের ঐক্যে নয়। এই জন্যই রামায়ণ হোলো মহাকাব্য, মহাভারতকে কোনো আলঙ্কাবিক মহাকাব্য বলে না। আলাপ যদি স্বতই সঙ্গীতের মহাকাব্য হয়, তো হোলো, নইলে হোলো না।

আমার সঙ্গে যাদেব মতের বা ভাবেব মিল নেই, তারা সেই অনৈক্যকে আমার অপরাধ বলে গণ্য কবে, তাদের দণ্ডবিধি আমার সম্বন্ধে নির্ম্মম। তাদেব নিজের বুদ্ধি ও রুচিকেই তাবা বুদ্ধিমত্তার যদি একমাত্র আদর্শ মনে করে তাতে ক্ষতি হয় না, কিন্তু সেটাকেই তাবা যদি ন্যায় অন্যায়েব শাশ্বত আদর্শ মনে ক'রে দণ্ডবিধি বেঁধে দেয় তবে ভারতেব ভাবী শাসনতন্ত্র তাদের আয়ত্তগত হলে এদেশে আমাব দানাপানি চলবে না। আমার বিচারকদের এই কঠোরতাই আমাব চিবাভ্যস্ত, সেই কাবণে তোমার ভাষাগত অনুকম্পায় আমি বিস্মিত। ভয়

হয় পাছে এটা টেঁকসই না হয়, অন্তত আমি যে ক দিন টিঁকি ততদিনের জন্যও। আশা করি মতের অনৈক্য সত্ত্বেও আমার মান বাঁচিয়ে চলবে। ইতি

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯ই এপ্রেল, ১৯৩৫

পুঃ—তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে তার মধ্যে অসংলগ্নতা কিছু দেখিনি। বস্তুত প্রথম পড়েই মনে করেছিলুম বলি, মেনে নিলুম। আমি অত্যন্ত কুঁড়ে, পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে প্রথমটা ইচ্ছে করে সম্মতি দিয়ে নীরবে আরাম কেদারা আশ্রয় করি; পরক্ষণেই সাহিত্যিক শ্রেয়োবুদ্ধি ওঠে প্রবল হয়ে। হাঁ না করতে করতে অবশেষে হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, "উচিত কথা বলতে ছাড়ব না"। উচিত কথা বলবার দুষ্প্রবৃত্তি মানুষের মস্ত একটা ব্যসন, উনিই হচ্চেন যত সব অনুচিত কথার পিতামহী।

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে ফিরে আবার সেই কথাটাই উঠে পড়ল—ভালো তো লাগে। সঙ্গীতের কোনো একটা বিশেষ বিকাশ সংযত সংহত সুসংলগ্ন সুপরিমিত মূর্ত্তি নাও যদি নেয়, তার মধ্যে বারে বারে পুনরাবৃত্তি ও সুদীর্ঘ কাল ধবে তান-কর্ত্তবের বাধাহীন আন্দোলন যদি দৈহিক ক্লান্তি ও অবকাশের সসীমতা ছাড়া থামবার অন্য কোনো হেতু নাও পায় তবুও তো দেখছি ভালো লাগে। ভালো লাগবার কারণ হচ্চে এই যে সঙ্গীতের উপকরণের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর গুণ আছে, তার ফলে, সুসম্পূর্ণ কলারূপ গ্রহণ না কবলেও সে আদর পেতে পারে। মাটির পিণ্ড যতক্ষণ না ঘট আকাবে সুপরিণত হয় ততক্ষণ সে মাটি। বিশেষভাবে কলা-সাধনাব গুণেই সে মহার্ঘ্য হয়। সোনার উজ্জ্বলতা প্রথম থেকেই চোখ জিতে নেয়। তার আপন বর্ণগুণেই সে পেয়েছে আভিজাত্য। অতএব তাল তাল সোনা যদি

স্তূপাকার করা যায় তবে সে অভিভূত করবে মনকে। তখন লুব্ধ মন বলতে চায়না আর বেশি কাজ নেই। অথচ "আর বেশি কাজ নেই" কথাটাই আর্টের অন্তরের কথা। আর্টের খাতিরেই যথাস্থানে বলা চাই, বাস্, চুপ, আর এক বর্ণও না। সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সম্পদ ধ্বনি-গৌরব। সেই কারণে কোনো কৌশলী লেখক যদি পাঠকের কান অভিভূত করে ধ্বনিমন্দ্রিত শব্দ বিস্তার করে চলে তবে অনেক ক্ষেত্রে তার অপরিমিতি নিয়ে পাঠক নালিশ উপস্থিত করে না। তার একটি দৃষ্টান্ত কাদম্বরী। শূদ্রক রাজার অত্যুক্তি-বহুল বর্ণনা চল্‌ল তিন চার পাতা জুড়ে; লেখকের কলমটা হাঁপিয়ে উঠে থাম্‌ল, বস্তুত, থামবার কোনো কলাগত কারণ ছিল না। একথা বলে কোনো ফল হয় না যে এতে সমগ্র গল্পের পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হচ্চে। কেন না, পাঠক থেকে থেকে বলে উঠচে, বাহবা বেশ লাগচে। বেশ লাগচে বলেই বিপদ ঘটল, তাই বাণীর প্রগল্‌ভতায় বীণাপাণি হার মেনে চুপ করে গেলেন। তার পরে এলো ব্যাধের মেয়ে, শুকপাখীর খাঁচা হাতে নিয়ে। বন্যা

বইল বর্ণনার, তটের রেখা লুপ্ত হয়ে গেল, পাঠক বল্লে, বেশ লাগচে। এই বেশ লাগা পরিমাণ মানে না। এমন স্থলে রচনার সমগ্রতাটা বাহন হয়ে দাসত্ব করে তার উপকরণের, সে আপন পূর্ণতার মাহাত্ম্যকে অকাতরে চাপা পড়তে দেয় আপন স্তূপাকার দ্রব্যসম্ভারের তলায়। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর ছাঁদে গল্প রচনা আর দুটি একটিমাত্র দৃষ্টান্ত লাভ করেছে, ও আর চলল না। যেমন একদা মেগাথেরিয়ম, ডাইনসর প্রভৃতি অতিকায় জন্তু আপন অসঙ্গত অতিকৃতির বোঝা অধিক দিন বইতে পারল না, গেল লুপ্ত হয়ে, এও তেমনি। সংস্কৃত সাহিত্য-অভিমানী কোনো দুঃসাহসিক আজ কাদম্বরীর অনুসরণে বাংলায় গল্প লেখবার চেষ্টা করবেই না—তার কারণ ওর মধ্যে শিল্পের সদাচার নেই। কিন্তু আমাদেব সঙ্গীতে আজও কাদম্বরীব পালা চলচে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সংস্রবে এসেছে; তাই আমাদের এমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে এই সাহিত্যে কলাতত্ত্বের মূলগত ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব। কিন্তু হিন্দুস্থানী গান ব্যবসায়ী গায়কদের গতানুগতিক রবার-নির্ম্মিত ঝুলির মধ্যে

রয়ে গেছে। বিশ্বজনীন আদর্শের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটলেও মন ও কানের অভ্যাসে বিরোধ ঘটবার সুযোগ হয় না। আজকালকার দিনে যাঁদের শিক্ষা ও রুচি বিশ্বচিত্তের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাঁরা যখন স্বাধীন মন নিয়ে বহুল সংখ্যায় গানের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হবেন তখন সঙ্গীতে কলার সম্মান পাণ্ডিত্যের দম্ভ ছাড়িয়ে যাবে। তখন কোন্ ভালো লাগা যথার্থ আর্টের এলাকার, অন্তত সমজদারের কাছে তা স্পষ্ট হতে পারবে। ইতি

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ই মে, ১৯৩৫

পরম পূজনীয়েষু

আপনার শেষ পত্রের উত্তরে আমি বলতে চাই যে কোনো গায়ক, কোনো আলাপিয়াও রূপ-সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু দুটি সংদেহ রয়ে গেল।

প্রথমতঃ, মানছি যে ছোটোর মধ্যে রূপ ফুটতে পারে, বড়োর মধ্যেও। কিন্তু great music কিংবা great poetry কি ভিন্ন শ্রেণীর নয়? ঐশ্বর্য্য দেখানোটা বর্ব্বরতা নিশ্চয়ই, কিন্তু চার-পদী দরবারী কানাড়ার তানসেনী ধ্রুপদ ও খাম্বাজের ঠুংরীর মধ্যে পার্থক্য আছেই। যদি কোনো উৎকৃষ্ট গায়ক, অর্থাৎ আর্টিস্ট সেই দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদকে বাহুল্য বর্জ্জিত করে আপনাকে শোনান, তবে সেই গায়নের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের জন্যই কি ঐ গানের ইঙ্গিত-আভাস স্থূল হয়ে উঠবে? আমার বক্তব্য, great হলেই তাকে ভোঁতা হতে

হবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন ছোটো হলেই ইঙ্গিতমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বৃহতের মধ্যেও সূক্ষ্ম আভাস রয়েছে দেখেছি, যেমন জৌনপুরের মসজিদে। Greatness-এর সংজ্ঞা দিতে পারছি না, সেটা শুদ্ধ নয়, খাদ-যুক্ত, তার সঙ্গে সংখ্যার ও আখ্যানবস্তুর আয়তনের সম্বন্ধ আছেই আছে—অন্ততঃ পটভূমিতে ত' রয়েইছে। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রাচুর্য্যকে প্রতিভার একটি নিদর্শন বলা হয়েছে।

একটা নতুন কথা তুলছি। এই অর্থে নতুন যে পূর্ব্বে আমি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করিনি। ধরুন আমি যদি বলি আমার দু'ঘণ্টা ধরে ছায়ানটের কি পূরিয়াব আলাপ শুনতে ভালই লাগে। না হয় নাই হোলো কলা, হোলোই বা আমার ওস্তাদী বুদ্ধি? আমি জানি আমার কান অশিক্ষিত নয়, আমার কানে শ্রুতির তারতম্য পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট। এই কানে যেটা ভাল লাগে সেইটাই হবে আর্ট। দাম্ভিকতা দেখাচ্ছি না— সকলেই এই ভাবে, আমি কেবল খোলাখুলি লিখলাম। আমি জানি আপনারও ভাল লাগে

সুরের বিকাশ। মার্জ্জিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাল লাগা না লাগাই হবে বিচারের কষ্টিপাথর, নয় কি? এই ব্যক্তিগত রুচিকে বাদ দিলে সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিরূপণের অন্য কি ব্যক্তিসম্পর্কহীন পথনির্দ্দেশক চিহ্ন থাকতে পারে? এই রূপসৃষ্টিটাই আমাদের সঙ্গীতের একমাত্র ভবিষ্যৎ আপনি কি হিসেবে বলতে পারেন?

ভাল লাগা না লাগাকে বাদ দিতে পারিনা—তাকে আপনি লোভই বলুন, আর আমি নিজে তাকে বর্ব্বরতাই বলিনা কেন। সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কি স্থাপত্যে? একটা কথা আছে, architecture is frozen music। সঙ্গীতের প্রাণ হোলো গতি—বরফ নিতান্তই স্থাণু।

প্রণত

ধূর্জ্জটি

কল্যাণীয়েষু

ভালো লাগা এবং না লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ। অর্থনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে তুমি যে রকম করে যা বোঝো আমি যদি সে রকম করে তা না বুঝি তাহলে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব নিশ্চয় বাধতে পারে কিন্তু সেইটে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন পরস্পর পরস্পরকে মূর্খ বলে নির্ব্বোধ বলে গাল দিতে পারি। সেটা শ্রুতিমধুর নয় বটে কিন্তু মূর্খতা নির্ব্বুদ্ধিতার একটা বাহ্য পরিমাপক পাওয়া যায়, যুক্তিশাস্ত্রের বাটখারা যোগে তার ওজনের প্রমাণ দেওয়া চলে। কিন্তু যখন পরস্পরকে বলা যায় অরসিক তখন তর্কে কুলোয় না। পৌঁছয় লাঠালাঠিতে। যেহেতু রস জিনিষটা অপ্রমেয়। বুদ্ধিগত বোঝা-বুঝির তফাৎ নিয়ে ঘর করা চলে সংসারে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু আমার ভালো লাগে অথচ তোমার লাগে না এইটে নিয়েই ঘর ভাঙবার কথা। অতএব সঙ্গীত

সম্বন্ধে উক্ত সাংঘাতিক বিপদজনক কথাটার নিষ্পত্তি করে নেওয়া যাক। তোমাতে আমাতে ভেদ পার হবার একটা সেতু আছে—সে হচ্চে তোমার সঙ্গে আমার ভালো লাগার অমিল নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নালিশ রয়ে গেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ—ওর বহুল নৈহারিকতার মধ্যে মধ্যে রসের জ্যোতিষ্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে আছে বহুকাল পূর্ব্বে একদা আমার শ্রোত্রী সখীদের পড়ে শুনিয়েছি এবং থেকে থেকে চমকে উঠেছি আনন্দে। সেইজন্যই আমার বড়ো দুঃখের নালিশ এই যে, এর মধ্যে আর্টের সংগতি রইল না কেন? মুক্তোগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে যায় গড়িয়ে যায়, ওদের মূল্য উপেক্ষা করতে পারিনে বলেই বলি সাতনলী হারে গাঁথা হোলো না কেন, তাহলে বুকে দুলিয়ে মুকুটে জড়িয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যেত। রাগিণীর আলাপে থেকে থেকে রূপের বিকাশ দেখা যায়, মন বলে একটি অখণ্ড সৃষ্টির জগতেই এদের চরম গতি, এদের সম্মান করি বলেই এদের রাস্তায় দাঁড় করাতে চাইনে, উপযুক্ত সিংহাসনে বসালেই এদের মহিমা

সম্পূর্ণ হোতো। সেই সিংহাসন চৌমাথাওয়ালা সদর রাস্তার চেয়ে সংহত সংযত পরিমিত, কিন্তু গৌরবে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বড়ো আয়তনের সঙ্গীতকে আমি নিন্দা করি এমন ভুল কোরো না। আয়তন যতই আয়ত হোক্ তবু আর্টের অন্তর্নিহিত মাত্রার শাসনে তাকে সংযত হতে হবে তবেই সে সৃষ্টির কোঠায় উঠবে। আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত. তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিষ পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সঙ্গীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে। কীর্ত্তনে গরাণহাটি অঙ্গের যে সঙ্গীত আছে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে গানের সেই আত্মসংযত ঔদার্য্য প্রকাশ পেয়েছে।

এইখানে একটা কথা বলা কর্ত্তব্য—গান রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন পথে গেছি গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জল-ধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো বড়ো বাগানওয়ালা-দের কীর্ত্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না। ইতি

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ই মে, ১৯৩৫

পরম পূজনীয়েষু

সেনেট্ হাউসের উৎসব-উপলক্ষে আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বাংলার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। গায়কের কণ্ঠে সংযম এবং রচনাপদ্ধতিতে সুসঙ্গতির একটা প্রয়োজন আছে বলতে গিয়ে আপনি ঐ বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেন। এতদিন ধরে আমাদের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হোলো তাতে সংযমের প্রয়োজনটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই সংযমের সঙ্গে বাংলা দেশের সংস্কৃতির সম্পর্ক কি?

আপনার মুখেই অনেক কথা শুনেছি তাই আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে থাকব না। কোনো দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে আমার সাহস হয় না। একদল ঐতিহাসিক (তাঁরা আবার জার্ম্মান) বলছেন—সে-জন্য চাই দিব্যানুভূতি। ও-বালাই আমার নেই। অতি-আধুনিক হয়ে হয়ত সমগ্রকে দেখবার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়েছে। আপনার সে-শক্তি আছে, এবং আপনার

অভিজ্ঞতা আরো গভীর ও ব্যাপক। আপনার শিক্ষাদীক্ষাও ভিন্ন, তাই আপনার মন্তব্য শুনতে ব্যগ্র।

আমার নিজের প্রথম প্রশ্ন হল এই: বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কি না? বিশেষ বলতে আমি ব্যক্তির অতিরিক্তকে বিশ্বাস করতে চাই না। এমন কোন্ বস্তু আছে যার কৃপাতেই আমরা বাঙালী, যার প্রকাশ কি উন্মেষই হল বাংলা-পরিশীলনের ইতিহাস? আমার বিশ্বাস, ঐ প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যেটি আছে সেটি কেবল মনঃকল্পিত সুবিধা-বাচক ধরতাই বুলি, মন্ত্রমাত্র। মন্ত্রোচ্চারণে সোয়াস্তি আছে, যাঁরা করেন তাঁদের, বাকি—সকলের নির্য্যাতন। যে-কোনো ধর্ম্মের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

অর্থাৎ, আমি গণমন মানছি না। তাই ব'লে মহাজনতন্ত্রেও বিশ্বাসী হতে পারিনা। স্বীকার করতে পারি না যে বাংলার বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তবে সেটি এক কিংবা একাধিক অ-সাধারণ ব্যক্তির কর্ম্মে ও ব্যবহারেই নিবদ্ধ। 'And above all, he was a Bengali' হাসি পায় শুনতে ও

পড়তে। যিনি যত বড় লোকই হোন্ না কেন, তিনি একাই আমাদের সকল সংস্কার তৈরী করেছেন, কিংবা তিনিই সর্ব্ববিধ সংস্কারের প্রতীক, প্রতিভূ, প্রতিনিধি, এ-কথা বল্লে জাতিকে, সমাজকে অপমান করা হয়। অপর পক্ষে, যে-সাধারণ ব্যক্তি ভোট্ দিয়ে ও না দিয়েই নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার ব্যবহারই কি is equal to বাংলার বৈশিষ্ট্য? মহাজন ও লোকজন—উভয়েরই দান আছে, কিন্তু জাতির সংস্কার উভয়ের সমষ্টি ভিন্ন আরো কিছু। এই অতিরিক্ত অ-শরীরী বস্তুর গুণাবলীকেই বৈশিষ্ট্য বলা হয়। তার আবার শক্তি আছে, সে-শক্তি আবার মহাজন, লোকজনের সব প্রয়াসকে এক ছাচে ঢালতে পারে, এবং ঢালাই উচিত! অর্থাৎ ভূদেবচন্দ্রস্য সমাজতত্ত্বম্—চিত্তরঞ্জন দাশস্য সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, বিপিনচন্দ্রস্য ধর্ম্ম-পরিচিতিঃ, লেনিন-হিট্‌লার-মুসোলিনীনাম্ শাসনতন্ত্রম্।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিংবা মূল-প্রকৃতিকে কোনো বস্তুর, কোনো স্থাণুসত্তার, কোনো অচল সারপদার্থের প্রত্যয়ও যদি না ভাবি, তাকে যদি সামাজিক গতি ও বিবর্ত্তনের বিবরণ হিসেবেই বুঝি, তাকে পোড়ে

পাওয়ার বদলে অর্জ্জন করাই যদি মানুষের স্বভাবের দায়িত্ব হয়, তবে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় নিশ্চয়। কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার ঘোরাল হয়ে ওঠে। ঐ ভাবে দেখলে কোনো পরিশীলনেরই নিজের রূপ থাকে না, থাকে নব্য-সংস্কৃতি-রচনার গুরুভার, আবার সে-গুরুভার পড়ে গিয়ে যে-ব্যক্তি পুরুষ হতে চায় তারই স্কন্ধে। সংস্কৃতির স্বাধীন নিঃসম্পৃক্ত সত্তা রইল কোথায়? কেবল কি তাই? সংস্কৃতিকে কেবল গতি কিংবা বিবর্ত্তন ভাবলে তার বিবৃতি কিংবা ইতিহাস লেখা ছাড়া আর কিছুই লেখা চলে না। অর্থাৎ, সে-সম্বন্ধে কোনো সুধীজন-অনুমোদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। আমারই ওপর যখন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার ভাব ও তাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়বার দায়িত্ব পড়ল, তখন অন্যে সে-ভার গ্রহণ করবে কেন? অন্যের ওপর চাপাতে আমি যাবই বা কেন? অতএব, তার সামাজিক শক্তি রইল না, এক কথায়, তার বৈশিষ্ট্য থাকল না, থাকল কেবল history of adaptation and adjustment, active or passive—নয় কি?

যদি কেউ ঐ বিবরণীতে কোনো রীতিনীতির

আবিষ্কার করতে পারে ত' বহুৎ আচ্ছা! সেটুকু তার কৃতিত্ব, সে তাই নিয়ে তার নিজের প্রভাব বিস্তার করুক! সে-কাজে তার কেরামতী, তার বাহাদুরী। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই মানতে হবে, সে-রীতিনীতি কোনো সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য নয়; আপনি বলতে পারেননা যে সে-রীতিনীতি সংস্কৃতির অন্তরাল থেকে গোপনে নিজের উদ্দেশ্য-সাধন করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটি আবার যা হচ্ছে তাই—তার বেশী জানবার কোনো উপায় নেই! বলা বাহুল্য, সংস্কারকে অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু সংস্কারও ত' নির্ব্বাচিত হতে হতে বর্ত্তমানের আকার ধারণ করেছে?

এই হল আমার মূলে আপত্তি। বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নিয়েই যদি কোনো ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তবে সে-ব্যক্তি তার দোহাইএ মানবেনা যে ভবিষ্যতের বাংলা গান পুরাতন বাংলা গানের ধারাতেই চলবে। আপনি অবশ্য তা বলেন নি, বলেন না, বলতে পারেন না; কারণ এই, আপনাব আপত্তি পুনরাবৃত্তিরই বিপক্ষে, হিন্দুস্থানী গানের পুনরাবৃত্তির বিপক্ষে নয়, কারণ, আপনার যুক্তি প্রাণধর্ম্মের

অনুযায়ী। কিন্তু লোকে ভুল বোঝবার ও করবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে গোড়া থেকেই হত্যা করা ভাল। গ্রাম্য-সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার চলছে, ঠুংরী, গজলের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ায় দেশে যা ছিল তাই ভাল ভাবতে লোকে সুরু করেছে—তাই আজ আপনার মন্তব্য পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলার বড়ই দরকার। প্রাদেশাত্মবোধের যুগ এসে গিয়েছে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি তর্কের খাতিরে না হয় মানলুম। কিন্তু নতুন culture-trait-কে নির্ব্বাচন করে নিজের মতো রূপ দেবার জন্য তাকে অন্ততঃ জীবন্ত হতে হবে। মারহাট্টা অঞ্চলে ষাট বৎসর পূর্ব্বে উত্তরভারতীয় গায়কী-পদ্ধতির চলন ছিল না, অথচ এখন সেই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা মারহাট্টী। মারহাট্টীরা উত্তর ভারতের ঢঙ্ নিলে কেন—এবং মাদ্রাজীরা নিলেনা কেন? কারণ এ নয়,—রহমৎ খাঁ, বালাজীবোয়া বোম্বাই-পুনাতে থাকতেন, কারণ, মারহাট্টী-সংস্কৃতি হয় ছিলনা, না হয় গিয়েছিল শুকিয়ে, এবং মাদ্রাজের একটা কিছু ছিল। মারাহাট্টী গায়ক অবশ্য দক্ষিণী অলঙ্কার হিন্দুস্থানী রাগিণীর গায়ে পরান, কিন্তু

গায়কী উত্তর-ভারতীয়ই থাকে। মাদ্রাজী গায়ক অপেক্ষাকৃত বেশী রক্ষণশীল। বাঙালী গায়ককে কী বলবেন ?

ধরাই যাক্—বাংলা দেশে যাত্রাগানে, কবির গানে, তরজায়, জারি, ভাটিয়াল, কীর্তন, আগমনীতে, বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় ও নিধুবাবুর টপ্পায় এবং রাম-প্রসাদ প্রভৃতি ভক্তের গানে কথারই ছিল প্রাধান্য, সুরের সীমা ছিল সুনির্দ্দিষ্ট, তানে ছিল সংযম। কিন্তু সে ধারাও ত' শুকিয়েছে? কেন তার বদলে সর্ব্বত্র জগাখিচুড়ীর পরিবেষণ হচ্ছে? তাতে নেই কি? আপনার, অতুলপ্রসাদের, দ্বিজেন্দ্র-লালের ভাত-ডাল-তরকারী সবই আছে—পেঁয়াজ রসুনও বাদ পড়েনি। কেন এ কাণ্ড হল? অথচ আপনারাও যেমন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী, নব্যতন্ত্রের রচয়িতারাও তাই। তাঁদের না হয় বাদ দিলাম—কিন্তু পাঁচালীর সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের গানের সম্বন্ধ নেই, যাত্রার জুড়ীর গানের সঙ্গে যে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের কোনো আত্মীয়তা নেই, বিদ্যাসুন্দরী গানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের কোনো যোগসূত্র নেই, এ-টুকু আপনাকে মানতেই হবে।

আজকালকার ট্রেড ইউনিয়ন মধ্যযুগের গণ, শ্রেণী, পুগের বংশধর নয়।

তা হলে বুঝতে হবে, বাংলার সঙ্গীত-পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। অতএব, প্রশ্ন হল, বাংলার বৈশিষ্ট্য অর্থে কতদিনের কয় পুরুষের ঐতিহাসিক পলিমাটি বুঝব? ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কি ছিল সঠিক জানিনা, কিন্তু গীতগোবিন্দে, পদাবলীতে বাঘা-বাঘা রাগরাগিণীর নাম বসান আছে। ডাঃ প্রবোধ বাগচী বলেন, আরো আগে ছিল। হয়ত নামকরণ পরে হয়েছে। গায়নও জানা নেই। কিন্তু বিষ্ণুপুর, বেথিয়া, ঢাকা অঞ্চলে মুসলমান ওস্তাদ অনেকদিন থেকেই রয়েছেন। ইংরেজ-নবাব, জমীদার এবং নতুন-শ্রেণীর বিত্তশালী মহাজনরাও হুঁকোর নল মুখে দিয়ে বাইজীর গান শুনতেন। শ্রাদ্ধবাসরে কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে বাইজীরও ডাক পাড়ত। তারপর ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে ত' সকলেই যেতেন। গোবরডাঙ্গার গঙ্গানারায়ণ ভট্ট, হালিসহরের জামাই নবীনবাবু, পেনেটির মহেশবাবু, শ্রীরামপুরের মধুবাবু, বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট, কোলকাতার নুলো

গোপাল প্রভৃতি ওস্তাদরা ত' সকলেই হিন্দুস্থানী চালে গাইতেন। বড় বড় গ্রামের জমিদার বাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান ওস্তাদ বরাবরই থাকত। পশ্চিমাঞ্চলের সব কালোয়াতই কোলকাতায় আসতেন। সেও আজ কতদিনের কথা। আপনিও সেই আবহাওয়ায় পুষ্ট। অতএব, হিন্দুস্থানী গায়কী পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় একদিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারাব সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইল যাত্রা-কীর্ত্তন-ভাটিয়ালের সঙ্গে- এ কেমন করে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার মতে এই ধারাও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যেব অন্য একটি দিক।

সামাজিক নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়াব তথ্য কি, না জানলে বাংলা গানে ও বাঙালী গায়কের মুখেব সঙ্গীতে সঙ্গতিব বিধিনিয়ম আবিষ্কৃত হবে না। বাংলাব বৈশিষ্ট্য কি আপনার কাছে শুনেছি—কিন্তু আজ আমাকে তাব প্রক্রিয়ার বিবরণ শোনান। এ কাজ বাঙালী পাববে না, ও কাজ বাঙালী পারবে, কাবণ বাঙালীব স্বভাবই তাই —যুক্তিটি বুদ্ধিস্পর্শী নয়, যদিও প্রাণস্পর্শী।

আফিমে ঘুম আসে কেন? কারণ আফিমে ঘুম আনবার শক্তি আছে·········বাঙালীর বাঙালিত্ব অনেকটা এই ধরণের।

আমার মত হল এই—সুরে সঙ্গতি-রক্ষা ভদ্র-মনেরই কাজ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নয়। যে-কোনো দেশের ভদ্রলোকের কাছে আমি সঙ্গীত-কলা প্রত্যাশা করতে পারি। অবশ্য ভদ্র, এবং গানে শিক্ষিত। সুগায়ক হবার জন্য general culture-এরই নিতান্ত প্রয়োজন, বাঙালী হবার, কেবলমাত্র বাংলার ঐতিহ্য বহন করবার প্রয়োজন নেই।

প্রণত

ধূর্জ্জটি

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

লাঠিয়াল যখন প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলানো কঠিন ব'লে বোঝে তখন সে মাটিতে বসে প'ড়ে দেহ সঙ্কোচ ক'রে, অর্থাৎ আঘাতের লক্ষ্যক্ষেত্রকে যথাসাধ্য সঙ্কীর্ণ করতে চায়। তোমার এবারকার প্রশ্নবর্ষণ সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা সেই ধরণের। সংক্ষেপে উত্তর দিলে বিপদকেও সংক্ষিপ্ত করা যায়। দেখি কৃতকার্য্য হোতে পারি কিনা। Race অর্থাৎ গণজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে কিনা এইটি তোমার প্রথম প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হয়। আকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবার জো নেই। চৈনিকের চেহারার সঙ্গে নিগ্রোর চেহারার তফাৎ নিয়ে তর্ক চলে না। আকৃতির ভেদ প্রকৃতির ভেদের কোনো সূচনা করে না এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। কাঁঠালের সঙ্গে তুলনায় সব আমেই মূল রসবস্তুর ঐক্য মানতে হয়, কিন্তু ন্যাংড়া আম ও ফজ্‌লি আমের মধ্যে

রসবৈশিষ্ট্যের যে ভেদ আছে, আকৃতিতে তার ইসারা এবং প্রকৃতিতে তার প্রমাণ যথেষ্ট। আল্‌ফন্সোর কৌলিন্য বাইরের চেহারার থেকে সুরু ক'রে ভিতরের আঁঠি পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে পরিচয়ের যোগ আছে।

যাকে সংস্কৃতি ব'লে থাকি অর্থাৎ কাল্‌চার্‌, সমস্ত য়ুরোপীয় জাতিব মধ্যে তা অনবচ্ছিন্ন। এই সংস্কৃতির বুদ্ধিক্ষেত্রে ওদের পরস্পরের সীমাচিহ্ন প্রায় মিলিয়ে গেছে। ওদের সায়ান্সের মধ্যে জাতিভেদ নেই, সমান হাটে ওদের বুদ্ধিবৃত্তির দেনাপাওনা অবারিত। কিন্তু ওদের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে পংক্তিভেদ আছে। অনুভূতিতে ইটালীয় এবং নর্‌বেজীয় এক নয়, ইংরেজ এবং ফরাসীর মধ্যেও প্রভেদ আছে। সে কেবলমাত্র ওদের রাষ্ট্রচালনায় নয়, ওদেব শিল্প-ভাবনায় প্রকাশ পায়। বলাবাহুল্য জর্ম্মান ও ফরাসীর চরিত্র ভিন্ন। জর্ম্মানি ও ইটালির ভৌগোলিক দূরত্ব অল্পই। কিন্তু ইটালির সীমা পেরিয়ে জর্ম্মানিতে প্রবেশ কববামাত্রই উভয় দেশের লোকের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই প্রভেদটি কুলক্রমে রক্তমাংস অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে অথবা বাইরের নানা ঐতিহাসিক কারণে এটা সংঘটিত, সে তর্ক আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন গণজাতির মধ্যে চরিত্রগত হৃদয়গত প্রভেদ অন্তত দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে একথা মানতেই হবে, চিরকাল চলবে কিনা সে আলোচনা অবান্তর।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্র সমভূমি না হোলেও এক মাটির। সেখানে চাষ করতে করতে ক্রমে অনুরূপ ফসল 'ফলানো যেতে পারে। তার প্রমাণ জাপান। সেখানকার মাটিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সায়ান্স শিকড় চালিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য শস্যের ফলনে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। য়ুরোপের বৌদ্ধিক প্রকৃতিকে সাধনাদ্বারা আমরা অঙ্গীকৃত করতে পারি তার কিছু কিছু প্রমাণ দেওয়া গেছে। কিন্তু তার চরিত্রকে পারছিনে, নানা শোচনীয় ব্যর্থতায় সেটা প্রত্যহ সুস্পষ্ট হোলো।

চরিত্র কর্ম্মসৃষ্টিতে, এবং হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তি রসসৃষ্টিতে আপন পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাঠামো এক হোলেও ইটালীয় ও জর্ম্মান সঙ্গীতের রূপের ভেদ আপনিই ঘটেছে। ওদিকে রুশীয় সঙ্গীতেরও বৈশিষ্ট্য রসজ্ঞেরা স্বীকার করেন।

হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙালীর প্রভেদ আছে, দেহে মনে, হৃদয়ে, কল্পনায়। বুদ্ধির পার্থক্য হয়তো দূর করা যায় একজাতীয় শিক্ষার দ্বারা ;—কিন্তু স্বভাবের যে দিকটা অন্তর্গূঢ় তার উপরে হাত চালানো সহজ নয়। আমাদের ধীশক্তিটা দারোয়ান, কোন্ তথ্যটাকে রাখবে কা'কে খেদিয়ে দেবে গোঁফে চাড়া দিয়ে সেটা ঠিক করতে থাকে, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজেও তার বাহাদুরী আছে ; সে থাকে মনের দেউড়ি জুড়ে। কিন্তু অন্তঃপুরের কাজ আলাদা,—সেইখানেই সাজ-সজ্জা, নাচগান, পূজা অর্চ্চনা, সেবার নৈবেদ্য, মনোরঞ্জনের আয়োজন। কুচকাওয়াজ প্রভৃতি নানা উপায়ে দারোয়ানটার পালোয়ানির উৎকর্ষসাধনের একটা সাধারণ আদর্শ আমরা বৈজ্ঞানিক পাড়া থেকে আহরণ করতে পারি কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের এক ছাঁদে গড়তে গেলে হাই-হীল্ড্ জুতোর উপর

দাঁড়িয়েও ভিতর থেকে তাদের ছাঁদ আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ে, কেবল সেই অংশে মেলে যেটা তাদের স্বভাবের সঙ্গে স্বতই সঙ্গত।

দ্বিতীয় কথা হচ্চে এই যে, বাংলা সংস্কৃতির যদি অবশ্যম্ভাবী বৈশিস্ট্য থাকেই তে, সেটা কি পুরাতনের পুনরাবৃত্তিরূপেই প্রকাশিত হোতে থাকবে? কখনই না, কারণ অপরিবর্ত্তনীয় পুনরাবৃত্তি তো প্রাণধর্ম্মের বিরুদ্ধ। সেকেলে কবির গানে পাঁচালি প্রভৃতিতে বাঙালি রুচির একটা আদর্শ নিশ্চয়ই পাওয়া যায় কিন্তু কালক্রমে তার কোনো পরিণতি যদি না ঘটে তবে বলতে হবে সে আদর্শ মরেছে। শিশুকে বড়ো হোতে হবে, সেই পরিবৃদ্ধির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্র বরাবর থাকে কিন্তু অন্তরে বাইরে বদল হয় বিস্তর। তার সজীব কলেবরটা বাহিরের নানা উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে, নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে চলে, নতুন পাঠশালায় নতুন নতুন শিক্ষালাভ করে। তার প্রভূত পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু মূল প্রাণের সূত্র যার দুর্ব্বল, পুনরাবৃত্তি বই তার আর কোনো গতি নেই। সেই পুনরাবৃত্তির অভাব দেখলেই

প্রথার দোহাই পাড়তে থাকে যে-বুদ্ধি সে শবাসনা।

আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিষ আছে, একটা হচ্চে গানের তত্ত্ব, আর একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন ক'রে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে। দেশ-কালপাত্রের সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য, যেমন সত্য সেকেন্দ্রাবাদ প্রাসাদের স্থাপত্য। তাকে প্রশংসা করব কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশকালপাত্রে হুঁচট খেয়ে সেটা সত্য হারাবে।

বাঙালীর মধ্যে "বিদগ্ধমুখমণ্ডন"-রূপে যে হিন্দুস্থানী গানের অনুশীলন দেখা যায় সেটা নিতান্তই ধনীর আঁচলধরা পূর্ব্বানুবৃত্তি। পূর্ব্বকালীন সৃষ্টিকে ভোগ করবার উদ্দেশে এই অনুবৃত্তির প্রয়োজন থাকতে পারে; কিন্তু সেইখানেই আরম্ভ আর সেইখানেই যদি শেষ হয়, দূরশতাব্দীর বাদশাহী আমলের বাইরে আমরা যে আজো বেঁচে আছি সঙ্গীতে তার যদি কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়,

তাহোলে এ নিয়ে গৌরব করতে পারব না। কেননা গান সম্বন্ধে যে দরিদ্র, এই অবস্থাতেই চিরবর্ত্তমান, তাকেই বলব—"পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী"। তার চেয়ে নিজের শাকভাত এবং কুঁড়েঘরও শ্রেয়।

বাংলাদেশে কীর্ত্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক্ না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক্। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জ্জন করেনি। সে-সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হোলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।

প্রত্যেক যুগের মধ্যেই এই কান্নাটা আছে, "সৃষ্টি চাই"। অন্যযুগের সৃষ্টিহীন প্রসাদভোগী হয়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে রক্ষা করবে তাকে সে আহ্বান করছে।

আধুনিক বাংলাদেশে গানসৃষ্টির উদ্যম সঙ্গীতকে কোনো অসামান্য উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে

কিনা, এবং সে উৎকর্ষ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট আদর্শ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কিনা সে কথাটা তত গুরুতর নয় কিন্তু প্রকাশের চাঞ্চল্যমাত্রেই তার যে সজীবতার প্রমাণ পাই সেইটেই সবচেয়ে আশাজনক। নব্যবঙ্গের গানের কণ্ঠ গ্র্যামোফোনের চেয়ে অনেক কাঁচা হোতে পারে কিন্তু স্বরটি যদি তার মাস্‌টর্স ভইস্‌ না হয়, তাতে যদি তার নিজের সুর খেলে, তাহোলে সে বেঁচে আছে এই কথাটা সপ্রমাণ হবে। তবে তার বর্ত্তমান যেমনি কচি হোক্‌ তার জোয়ান বয়সের ভবিষ্যৎ খুলবে আপন সিংহদ্বার। সে ভবিষ্যৎ নিরবধি।

বাঙালীর চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের প্রতিভাও সাহিত্য প্রবণ। তার মন আপন বড়ো বড়ো বাতি জ্বালিয়েছে সাহিত্যের মন্দিরে। প্রকৃতির গৃহিণী-পনায় মিতব্যয়িতা দেখা যায়, শক্তির পরিবেষণে খুব হিসেব ক'রে ভাগবাটোয়ারা হয়ে থাকে। মাছকে প্রকৃতি শিখিয়েছেন খুব গভীর জলে ডুব সাঁতার কাটতে, আর উচ্চ আকাশে উধাও হোতে শিখিয়েছেন পাখীকে। কখনো কখনো সামান্য

পরিমাণে কিছু মিশোল ক'রেও থাকেন। পানকৌড়ি কিছুক্ষণের মতো জলে দেয় ডুব, উড়ুক্কু মাছ আকাশে ওড়ার সখ মেটায়। ইংলণ্ডে সাহিত্যে জন্মেছেন শেক্স্‌পীয়র, জর্ম্মানিতে সঙ্গীতে জন্মেছেন বেটোফেন।

সত্যের খাতিরে একথা মান্‌তেই হবে যে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্র-সঙ্গীতে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্রসঙ্গীত সম্পূর্ণই সাহিত্য-নিরপেক্ষ। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে অর্থহীন তোম্‌-তা-নানা শব্দে তেলেনার বুলি ভাষাকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না। বাংলাদেশে যন্ত্রসঙ্গীত নিজের কোনো বিশেষত্ব উদ্ভাবন করেনি। সেতার, এস্‌রাজ সরদ রবাব প্রভৃতি যন্ত্র হিন্দুস্থানের বানানো, তার চর্চাও হিন্দুস্থানেই প্রসিদ্ধ। "ওরে রে লক্ষ্মণ, একি কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ" প্রভৃতি পাঁচালি-প্রচলিত গানে অর্থ স্বল্পই, অনুপ্রাসের ফেনিলতাই বেশি, অতএব প্রায় সে তেলেনার কাছ ঘেঁষে গেছে, কিন্তু তবু তোম্‌ তানানানার মতো অমন নিঃসঙ্কোচে নিরর্থক নয়। পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই :-

কালো কালো কম্বল, গুরুজি, আমাকে কিনে দে ;

রাম-জপনের মালা এনে দে, আর জল পান করবার তুম্বী।— ঐ ফর্দ্দে উদ্ধৃত ফরমাসী জিনিষগুলিতে যে সুগভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালী, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম ঃ—

গুরু আমায়, মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ হোক্ জপের মালা
নাম-মণির দীপ্তিজ্বালা,
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়তৃষা।

কিন্তু এ গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হোত সাহিত্যের খাঁচার পাখী। হিন্দুস্থানী গাইয়ে তানপুরা নিয়ে বসলেন, বললেন, "আমার এই চুণরিয়া লাল রং ক'রে দে; যেমন তোর ঐ পাগড়ি তেম্নি আমার এই চুণরিয়া লাল রং ক'রে দে।" বাস্ আর কিছু নয়, এই ক'টি কথার উপর কানাড়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করলে। বাঙালী গাইলে,—

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে।
আমার যে ভালোবাসা তোমা বই আর জানিনে।
হেরিলে ও মুখশশী আনন্দ সাগরে ভাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসি নে।

যা-কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই ব'লে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।

বাঙালীর এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে। বল্‌লে চলবে না রাতের বেলাকার চক্রবাক-দম্পতির মতো ভাষা পড়ে থাকবে নদীর পূর্ব্বপারে আর গান থাকবে পশ্চিম পারে and never the twain shall meet। বাঙালীর কীর্ত্তন গানে সাহিত্যে সঙ্গীতে মিলে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে প্রিমিটিভ্‌ এবং ফোক্‌ মূ্যজিক ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্ত্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।

বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হোতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, —আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে। একদিন বাংলার সঙ্গীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে ব'সে ব'সে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সঙ্গীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার কালের গ্র্যামোফোনসঞ্চারী গীতপতঙ্গের দুর্ব্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্ত্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে। কিন্তু গানসৃষ্টিতে আজ যেগুলিকে ছোটো দেখাচ্চে, অসম্পূর্ণ দেখাচ্চে, তারা পূর্ব্ব দিগন্তে খণ্ড ছিন্ন মেঘের দল, আষাঢ়ের আসন্ন রাজ্যাভিষেকে তারা

নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে এসেছে, দিগন্তের পরপারে রথচক্রনির্ঘোষ শোনা যায়। ইতি—

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ই জুলাই, ১৯৩৫

পুঃ—বাংলা যন্ত্রসঙ্গীতসৃষ্টি কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছবে তা বলা কঠিন, প্রতিভার লীলা অভাবনীয়। এককালে থিয়েটারে কন্সার্ট নামে যে কদর্য্য অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মরেছে—এইটেই আশাজনক।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

*   *   *

এই সূত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। সঙ্গীতের প্রসঙ্গে বাঙালীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা উঠেছিল। সেইটেকে আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাঙালী স্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালী প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে একজন জাপানী আমাকে বলেছিল, রাষ্ট্রবিপ্লবের আর্ট তোমাদের নয়, ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ্য করে তুলেছ, সিদ্ধিলাভের জন্য যে তেজকে যে সঙ্কল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয় গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দাও। এই জাপানীর কথা ভাববার যোগ্য। সৃষ্টির কার্য্য যে কোনো শ্রেণীর হোক্ তার শক্তির উৎস নিভৃতে

গভীরে, তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে ভাবসংযমের দরকার। যে উপাদানে উচ্চ অঙ্গের মূর্ত্তি গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রতিরোধের কঠোরতা থাকা চাই, ভেঙে ভেঙে কেটে কেটে তার সাধনা। জল দিয়ে গলিয়ে যে মৃৎপিণ্ডকে শিল্পরূপ দেওয়া যায় তার আয়ু কম, তার কণ্ঠ ক্ষীণ। তাতে যে পুতুল গড়া যায় সে নিধুবাবুর টপ্পার মতোই ভঙ্গুর।

উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা। সেখানকার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির মতোই; অর্থাৎ সেখানে রূপ কুরূপ হতেও সঙ্কোচ করে না, কেননা তার মধ্যেও সত্যের শক্তি আছে, যেমন মরুভূমির উট, যেমন বর্ষার জঙ্গলে ব্যাঙ, যেমন রাত্রির আকাশে বাদুড়, যেমন রামায়ণের মন্থরা, মহাভারতের শকুনি, শেক্স্পীয়ারে ইয়াগো।

আমাদেব দেশের সাহিত্য-বিচারকের হাতে সর্ব্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি; সেই নিক্তিতে তারা এতটুকু কুঁচ চড়িয়ে দিয়ে দেখে তারা যাকে আদর্শ বলে তাতে কোথাও কিছুমাত্র কম

পড়েছে কিনা। বঙ্কিমের যুগে প্রায় দেখতে পেতুম অত্যন্ত সূক্ষ্মবোধবান সমালোচকেরা নানা উদাহরণ দিয়ে তর্ক করতেন, ভ্রমরের চরিত্রে পতিপ্রেমেব সম্পূর্ণ আদর্শ কোথায় একটুখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে আর সূর্য্যমুখীর ব্যবহারে সতীর কর্ত্তব্যে কতটুকু খুঁৎ দেখা দিল। ভ্রমর সূর্য্যমুখী সকল অপরাধ সত্ত্বেও কতখানি সত্য আর্টে সেটাই মুখ্য, তারা কতখানি সতী সেটা গৌণ, একথার মূল্য তাদের কাছে নেই; তারা আদর্শের অতি-নিখুঁতত্বে ভাবে বিগলিত হয়ে অশ্রুপাত করতে চায়। উপনিষৎ বলেছেন আত্মার মধ্যে পরম সত্যকে দেখবার উপায় শান্তোদান্ত উপরতাস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা। আর্টের সত্যকেও সমাহিত হয়ে দেখতে হয়, সেই দেখবার সাধনায় কঠিন শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

বাংলা দেশে সম্প্রতি সঙ্গীতচর্চ্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সঙ্গীতরচনাতেও আমার মতো অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্লাসিকাল অর্থাৎ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্ব্বল রস-মুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু

অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিষ্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্ত্তা দরবারী তোড়ি দরবারী কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। নূতন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা, কেননা তাঁরা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। বহুযুগ থেকে তাঁদের সৃষ্টির পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেচি, সেটাই যথার্থত তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। এখনকার রচয়িতার গীতশিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্মপ্রকাশ হয় তাহলে তাতে করেই সেই সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।

সবশেষে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে

পেয়েছে তখন আমি সকল কর্ত্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্ত্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য। নব নব যুগের মধ্যে দিয়ে এই আত্মসত্যপ্রকাশের আনন্দধারা যেন প্রবাহিত হতে থাকে এইটেই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। কেন বাজাও কাঁকণ কন কন কত ছলভরে—এতে যা প্রকাশ পাচ্চে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাবপ্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপপ্রকাশ অহৈতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্না হাসির সম্পর্ক

দেখিনে তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা। যে বিলাসীরা টপ্পা ঠুংরি বা মনোহরসাঞ্জী কীর্ত্তনের অশ্রুআর্দ্র অতিমিষ্টতায় চিত্তবিগলিত করতে চায় এ গান তাদের জন্য নয়। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ—তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সঙ্গীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন। ইতি—

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই জুলাই, ১৯৩৫

এই পত্রাবলীর একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ১৯৩৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে All-Bengal Music Competition and Conference-এর প্রথম অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথ তার উদ্বোধন করেন। সেই সময় আমি লক্ষ্ণৌ থেকে অসুস্থ হয়ে কোলকাতায় চলে আসি। বন্ধুদের আহ্বানে এবং লোভের বশে আমি অধিবেশনে যোগ দিই। রবীন্দ্রনাথ আসছেন শুনে আমি তাঁকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করবার অনুরোধ জানাই। তিনি সে-অনুরোধ রক্ষা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দুটি; সঙ্গীত ও জীবন নিবিড়ভাবে যুক্ত, অতএব, জীবনের বিকাশ যেমন রূপবৈচিত্র্যে সংসাধিত হয়, সঙ্গীতেরও তেমনি অনুযায়ী অভিব্যক্তি নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির যুগোপযোগী রূপপরিবর্ত্তন যদি কল্পনার অতিরিক্ত হয় তবে বুঝতে হবে যে তার মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গীতের ইতিহাসে যাঁরা যুগপ্রবর্ত্তক বিবেচিত হন তাঁরা কখনও গতানুগতিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের সৃজনীশক্তিকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল বাংলা গানের বিশেষ রূপ সম্বন্ধে। বাংলা গানের একটি স্বকীয়তা আছে—সেটি সুরেরও নয়, কথারও নয়, সুর ও কথার প্রকৃষ্ট মিলনের। তার রস ভিন্ন, কারণ তার রূপ পৃথক। সুতরাং, বাংলা গানের ভবিষ্যৎ ওস্তাদের মুখের হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর অনুকরণের ওপর নির্ভর করছে না, পুনরাবৃত্তির ওপরও না। এই দুটি বক্তব্য

তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে বক্তৃতাটি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়েই তাঁকে সঙ্গীত সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি পুস্তিকা লেখবার তাগিদ দিতে সুরু করি। স্বাস্থ্যের ও সময়ের অভাবে তিনি পুস্তিকা লিখতে পারেননি। আমাকে চিঠি দিতেন, আমিও উত্তর দিতাম, প্রশ্ন করতাম। আমার সকল চিঠির নকল রাখিনি। তার পর লাহোর থেকে ফেরবার পথে মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ তিন দিন অধ্যাপক নির্ম্মল সিদ্ধান্ত এবং শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা দেবীর অতিথি হন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলোচনারও সুযোগ পাই। এক সন্ধ্যায় গানের জল্‌সা হয়। তখন তাঁর ১০২ ডিগ্রীর ওপর জ্বর। শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকার ছায়ানট, জয়জয়ন্তী ও পরজের খেয়াল গেয়েছিলেন—রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে গান শুনলেন। শ্রীকৃষ্ণের গান তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আসর ভাঙ্গবার পর তিনি আমাকে বলেন, 'গান আমার খুবই ভাল লাগল। কিন্তু সেই ভাল-লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গোটা কয়েক প্রশ্ন উঠেছে—তোমাকে তার উত্তর দিতেই হবে। গায়কের মুখের গান থামবে কখন? প্রত্যেক রস-সৃষ্টিতেই একটি থামবার ইঙ্গিত থাকে—ধ্রুপদে আছে, বাংলা গানে আছে, যদু ভট্টের, গোঁসাইএর গলায় ছিল, কিন্তু খেয়ালে থাকবেনা কেন? একই গানে গায়ক তার সমগ্র

কৃতিত্ব, তার সব ঐশ্বর্য্য ঢেলে দেবেন কেন? একটা ছায়ানটের স্থানে দশটা দশ রকম চালের ছায়ানট গাও, আমার অত্যন্ত ভাল লাগবে, কিন্তু একটি রচনায় ছায়ানটের সব রূপ দেখালে, তার সমগ্র বিভব ভ'রে দিলে, রচনার মর্য্যাদা, তার সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব রক্ষা হয় কি?' রাত বারটা পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে কথা কন। তখন আমি উত্তর দিতে পারিনি, আমার দীর্ঘ পত্রে উত্তর দেবার প্রয়াস আছে। এই হল 'সুর ও সঙ্গতি'র ইতিহাস।

কিন্তু প্রশ্নগুলি সাংঘাতিক—তাদের উত্তরের ওপর সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের সম্ভোগ ও সমালোচনার প্রকর্ষসাধন নির্ভর করছে। শরৎ বাবুও দিলীপকুমারকে বলেছিলেন, 'ওস্তাদ গায় ভাল বলছ—কিন্তু থামতে জানে ত'?' রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যখন উভয়েই থামতে জানার প্রয়োজন স্মরণ করাচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে যে বিরাম চাওয়ার মধ্যে অধৈর্য্য নেই, আছে উপভোগের প্রকৃতিকে শুদ্ধ করবার উপদেশ, আছে সঙ্গীতে সঙ্গতির সুনিশ্চিত ইঙ্গিত।

আমাদের দেশে সঙ্গীত-সমালোচনা নেই বল্লেই হয়। তার নানা কারণ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এখন মুমূর্ষু অবস্থা—তার উন্নতি অসম্ভব ধারণাটাই তার চিহ্ন। যখন সৃষ্টি অর্থাৎ অভিনব-রূপের বিকাশ চলছে, তখনই সমালোচনা জীবন্ত হয়। নচেৎ, ভাল লাগা না লাগাতেই বিচারের

শেষ। যে-যুগে সৃষ্টি সেই যুগেই সমালোচনা, মজুরী বাড়বা র সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মঘট। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি নতুন আগ্রহ জেগেছে—তাই এই সময় সমালোচনার প্রয়োজন উঠল। নতুন আগ্রহের একদিক হল পুনরুদ্ধার ও পুনরাবৃত্তি, অন্য দিক হল নতুন ঢঙ্এর সৃষ্টি। ঐতিহ্যের প্রধান গুণ হল এই যে তাকে নতুনের বিচার-দণ্ড হিসেবেও ধরা যায়। এইখানেই পুনরুদ্ধারের আধুনিক প্রয়োজন। কিন্তু পুরাতন সংস্কৃতি নব্য-প্রয়াসের বিচারের জন্য ব্যবহৃত হল কি তাকে শাস্তি দেবার জন্য দণ্ড হিসেবে চালান হল বিচার করবে কে?

সাহিত্য-সমালোচনায় যা হচ্ছে সঙ্গীত সমালোচনাতেও তাই হবে। বাংলা সাহিত্য আজকাল বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেণীতে ওঠবার প্রয়াসী, তাই যিনি লেখক ব'লে গণ্য হবার দাবী করেন তাকে বিশ্ব-সাহিত্যের পরিমাণে পরীক্ষিত হ'তে সদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। পরীক্ষকের স্বজাতি বলেই তিনি পার পাবেন না। কিন্তু আমাদের সঙ্গীত এখনও বিশ্বের সাথে যুক্ত হয় নি। সেটা যে অন্য দেশের সঙ্গীতের মতনই এক প্রকারের সঙ্গীত, অতএব তার যথাবিহিত সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে, এটুকু আমরা হৃদয়ঙ্গম করিনি। সাহিত্যে আমরা অনেকটা হয়ত বুঝেছি যে বাঙ্গালীও মানুষ, তার অনুষ্ঠান জাগতিক অনুষ্ঠানের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তার জীবন অন্য জাতির জীবনের সাথে

যুক্ত। সাহিত্যে তাই আজকাল আমরা বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ওপরও ঝোক দিয়ে থাকি। কিন্তু সঙ্গীতে আমরা এখনও নিরালম্ব রয়েছি, তার বিশেষত্বে এবং চরম উৎকর্ষে আমরা এতই আস্থাবান যে তার ওপর সাধারণ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করি। অন্য সভ্য-সমাজে সঙ্গীত আছে, সে দেশে সঙ্গীতের নতুন রূপ তৈরী হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গীত-সমালোচনা অনেক দূর এগিয়েছে জানলে বোধ হয় আমাদের অবস্থার আংশিক উন্নতি সম্ভব।

বলা বাহুল্য, বিদেশী সঙ্গীতপদ্ধতির অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হলে আমাদের সঙ্গীতের উন্নতি অসম্ভব। তবে পূর্ব্বলিখিত দুটি কারণ ব্যতীত অন্যান্য যে-সব বিপত্তির জন্য আমাদের ধ্রুবপদ্ধতি লোপ পেতে বসেছে তাদের দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির দিকেও ঝোঁক দিতে হবে এবং সঙ্গীতকে যে অন্যান্য কলাবিদ্যার মতন বিচার করতে হবে—এ কথা জোর করেই বলা যায়। অন্য কলাবিদ্যার আলোচনায় সৃষ্টির সমগ্র রূপ, তার অন্তর্নিহিত অনিবার্য্য পরিণতির নীতি প্রথমেই বিচার্য্য। কবি তাই সঙ্গীতের সীমা ও সঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলা দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই যে বাঙ্গালী অনুকরণ করতে পারবে না, সে সৃষ্টি করবেই করবে, এবং তার সংস্কৃতি অনুসারে সে চলবেই চলবে। বাংলা দেশের সঙ্গীতের ধারাই হল সুর ও কথার সমন্বয়-সাধনে সৃষ্টি।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের এই মতামত সকলের প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য সঙ্গীত নিয়ে, তার নিজের রচনা নিয়ে নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার তাঁর অধিকার আছে। তিনি হিন্দুস্থানী সুরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা আজন্ম পরিবৃত, নিজে ওস্তাদ না হয়েও হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পরিচিত, নানাপ্রকারের সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলি শুদ্ধ, বাকীগুলি মিশ্রিত, এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট শ্রোতা। তদভিন্ন তিনি অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শুনেছেন। সব চেয়ে বড় কথা এই যে তিনি একজন সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ও রসজ্ঞ। যাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের নানা কলাবিদ্যাকে বিশ্বের দরবারে এনেছে তাঁর সঙ্গীতের রূপ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত অতিশয় মূল্যবান। একমাত্র বিশেষজ্ঞের দাম্ভিকতাই তাঁর সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে। যিনি রসসৃষ্টির অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে বিশ্বাস করেন তিনিই সশ্রদ্ধভাবে কবির মন্তব্য বিচার করবেন। গ্রহণ নয়, বিচার, কারণ কবির বিশ্বাস, বুদ্ধির পরিচয় গ্রহণে নয়, অনুকরণেও নয়, নির্ব্বাচনে।

পত্র-বিনিময়ে আমার অংশ সামান্য। আমি কেবল তাঁকে চিঠি লিখতেই অনুরোধ করেছি। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তরফ থেকে যতটুকু বলা আমার পক্ষে শোভন ও সম্ভব আমি তাই বলেছি। আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি

তাঁকে বিরক্ত করবার সুবিধা পাননি হয়ত, আমি সেই সুযোগ পেয়েছি—এইটুকুই আমার ভাগ্য। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আছে—এই খবরটুকু দেবার প্রয়োজন স্বীকারেই আমার লজ্জা।

বিশেষজ্ঞের প্রতি আমার প্রথম অনুরোধ—তাঁরা যেন ভোলেন না যে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ তাঁদের মতনও বুদ্ধিমান। এই বিশ্বাসটুকু থাকলে বিচারের ও সমালোচনার অগ্রস্থতি সম্ভব হবে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—তাঁরা যেন এই পুস্তিকার বিচারে কবির সঙ্গীত-রচনার বিচার না করে বসেন। আমি নিজে এই দোষ করেছি—কবি সাবধান করেও দিয়েছেন। কিন্তু কবি পত্রই লিখেছিলেন, আমিও ছাপাবার জন্য উত্তর দিইনি। তাঁর পত্রের মৌলিক রস অক্ষুণ্ণ রাখাই আমার কর্ত্তব্য—কে তাঁর মত চিঠি লিখতে পারে! তাঁর চিঠির উত্তরে আমার প্রবন্ধ হোতো তাঁর অপমান। তাই ভুল সংশোধন করতে মন চাইল না।

বাংলা অক্ষরে ইটালিক্স্ চলে না, তলায় দাগ দিলে পাঠ্যপুস্তকের মতো দেখায়। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক মতামত সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা মন থেকে চলে যাবে, এই আমার দুরাশা। শেষের চিঠিটার প্রতি আধুনিক রচয়িতার ও গায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর ধ্রুপদ প্রীতিও লক্ষ্য করবার জিনিষ।

তারিখ অনুযায়ী চিঠিগুলি সাজান নয়, যুক্তি অনুযায়ী।

বালিগঞ্জ, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১লা শ্রাবণ, ১৩৪২